দাম : ষোলো টাকা

# স্বস্তিকা

৭৪ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা।। ২৭ জুন, ২০২২।। ১২ আষাঢ় - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

## প্রতিবাদের নামে দেশজুড়ে তালিবানি সন্ত্রাস

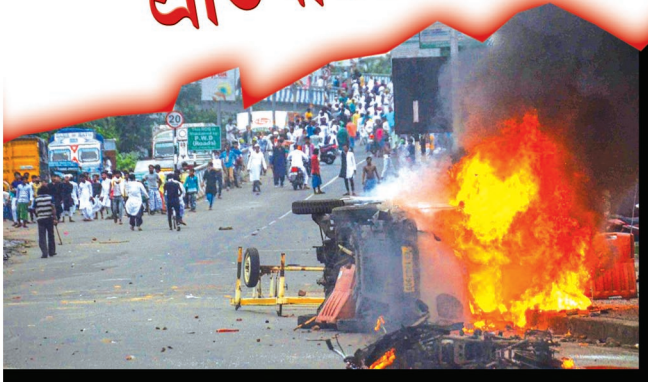

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭৪ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ১২ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২৭ জুন - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

**সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)**

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩**

**দাম : ১৬ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় □ ৫

**বিশ্বাসযোগ্যতা ঠেকেছে তলানিতে, তাই গাজোয়ারি বন্ধ করুন মমতা** □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

**দিল্লির টাকা, বাংলার আবাস** □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

**অগ্নিপথ একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ** □ স্বামীনাথন আইয়ার □ ৮

**রাজনৈতিক ইন্ধন ছাড়া এই তাণ্ডব সম্ভব নয়** □ তারক সাহা □ ১০

**ধর্মনিরপেক্ষতার আমদানি হয়েছিল তুষ্টিকরণের স্বার্থে** □ পিন্টু সান্যাল □ ১১

**আগামী তিরিশ বছরেই কলকাতার সলিল সমাধি** □ হীরক কর □ ১৩

**ইউরোপের রেনেসাঁ কি ভারতীয় সভ্যতার পুনর্জন্ম?** □ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ১৫

**বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রাণ বলিদান দিয়েছেন যাঁরা** □ নিমাই চাঁদ গুঁই □ ১৭

**প্রতিবাদের নামে সারা দেশে তালিবানি সন্ত্রাস** □ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় □ ২৩

**কেন্দ্র সরকারকে ইসলাম বিরোধী প্রতিপন্ন করতে নূপুর শর্মাকে সফট্ টার্গেট করা হলো** □ সত্যপ্রকাশ ন্যায়মূর্তি □ ২৬

**বারো মাসে পঁচিশরকম বেশে সজ্জিত হন শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেব** □ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল □ ৩১

**দানিউব নদীতীর থেকে প্রিয় ভারতের মাটিতে** □ কৌশিক রায় □ ৩৪

**জ্ঞানবাপী মামলার আগে পঞ্চকন্যার প্রস্তুতি** □ দুর্গাপদ ঘোষ □ ৩৫

**রেকর্ড সংখ্যক মানুষ উত্তরবঙ্গের রামকেলি মেলায়** □ তরুণ কুমার পণ্ডিত □ ৩৭

**পশ্চিমবঙ্গ কেবল একটি প্রদেশের নাম নয়, শত শত বছরের একটি আস্ত ইতিহাস** □ কল্যাণ গৌতম □ ৪৩

**নিয়মিত বিভাগ**

**চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ □ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৮ □ অন্যরকম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ □ চিত্রকথা : ৫০**

প্রকাশিত হবে
৪ জুলাই
২০২২

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৪ জুলাই
২০২২

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

### শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে জওহরলাল নেহরু ও ফজলুল হকের সম্পর্ক নিয়ে লিখবেন বিনয়ভূষণ দাশ ও বিমলশঙ্কর নন্দ। এছাড়াও থাকবে শ্যামাপ্রসাদের ছেলেবেলা নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা। লিখবেন ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, ড. অনির্বাণ গাঙ্গুলি।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
**AXIS Bank Ltd.**
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার পাঠক, গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের জানানো হচ্ছে যে, বিশেষ কারণবশত আগামী ৪ জুলাই, ২০২২ সংখ্যা থেকে স্বস্তিকা'র প্রতি কপির মূল্য ১৬.০০ টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭০০.০০ টাকা করা হচ্ছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হলো, এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আশাকরি আপনারা আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন।

আগামী জুলাই মাস থেকে স্বস্তিকায় দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় পাঠাবেন—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name : **INDIAN OVERSEAS BANK**
**Sreemani Market Branch, Kolkata - 700 006**

সারদা প্রসাদ পাল
প্রকাশক, স্বস্তিকা

*জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী*

# সম্পাদকীয়

## এই তাণ্ডব মানুষ আর সহ্য করিবে না

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার ভারততীর্থ কবিতায় লিখিয়াছেন, শক-হুন-দল-পাঠান-মোগল এক দেহে হলো লীন। কাজী নজরুল ইসলাম লিখিয়াছেন, মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান। বলা হইয়া থাকে কবিরা ক্রান্তদর্শী হইয়া থাকেন। তাঁহাদের দূরদৃষ্টি রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের স্বপ্ন পূরণের কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যায় নাই। তাঁহারা হয়তো ভাবিয়াছিলেন শক-হুন-কুষাণ যেইভাবে ভারতবর্ষের মূল ধারায় একীভূত হইয়াছে , সেইভাবেই পাঠান-মোগলরাও ভারতবর্ষের সমাজজীবনে সম্মিলিত হইয়া যাইবে। কিন্তু বহু শতাব্দী অতিবাহিত হইলেও তাহার কোনো লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। সমাজবিজ্ঞানীরা বলিতেছেন ভারতবর্ষীয় সমাজের আত্তীকরণের ক্ষমতা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই তাহা সম্ভব হইতেছে না। ইসলামি আক্রমণকারীরাই প্রথম ভারত অভিযানকারী বিদেশি নহে। ইহাদের পূর্বে গ্রিক, ইরানি, পার্থিয়ান , সিথিয়ান, কুষাণ, হুন ও শকেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল। তখন ভারতবর্ষীয় সমাজের আত্তীকরণের ক্ষমতা এতই প্রবল ছিল যে আক্রমণকারীরা ভারতীয়দের সহিত একীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের নিকট তাহারা আর কোনোরূপ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষীয় সমাজেরই একজন হইয়া 'পরম ভাগবত' উপাধি পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহুদিরা দুই সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বসবাস করিয়াও এই ভূখণ্ডের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক কোনোরূপ সমস্যা উৎপন্ন করে নাই। পারসি জনগোষ্ঠীর লোকেরা তাহাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করিয়াও সুদীর্ঘকাল এই দেশে বসবাস করিতেছেন এবং অদ্যাবধি এই দেশকে সমৃদ্ধ করিতেছেন।

ইসলাম মতাবলম্বী জনগোষ্ঠী বহু শতাব্দী ভারতবর্ষে বসবাস করিয়াও ভারতবর্ষীয় সমাজজীবনের সহিত সম্মিলিত হওয়া তো দূরের কথা, সমস্যার পর সমস্যা তাহারা উৎপন্ন করিয়াছে। কোনো সময়ে ভারতবর্ষের সহিত একীভূত হইবার মানসিকতা তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নাই। ভারতবর্ষের মূল নিবাসীদের রক্তে তাহারা হোলি খেলিয়াছে। কলকাতা ও নোয়াখালিতে তাহারা হিন্দুর রক্তে মাটি লাল করিয়াছে। ভারতবর্ষকে তাহারা দ্বিখণ্ডিত, ত্রিখণ্ডিত করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। যে কোনো সময় যে কোনো অজুহাত খাড়া করিয়া তাহারা এই দেশের সম্পদ ধ্বংস করিয়াছে। এই দেশের প্রতি তাহারা কোনোদিন কোনোরূপ মমত্ব দেখায় নাই। মসজিদে ও মাদ্রাসায় প্রতিদিন উত্তেজক ভাষণে তাহাদের অস্থির করিয়া তোলা হয় এই বলিয়া যে, ভারতবর্ষকে ইসলামিস্তান না করিয়া তাহাদের বিশ্রাম গ্রহণ করা চলিবে না। ইহাতে নাকি তাহাদের ন্যায্য দাবি রহিয়াছে। এক বৎসর পূর্বে তাহারা সিএএ, এনআরসি-র বিরোধিতার নামে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিপুল পরিমাণে ধ্বংস করিয়াছে। সম্প্রতি তাহাদের নবিকে অপমান করা হইয়াছে বলিয়া আবার ধ্বংস কার্যে মাতিয়া উঠিয়াছে। দেশের ভোটভিখারি রাজনৈতিক দলগুলিরও ইহাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন মদত রহিয়াছে। তাহারা ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের আগ্রাসী মানসিকতার মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ, সংশোধন ও নির্মূল করিবার চেষ্টা না করিয়া ধর্মনিরপেক্ষীয় ঔদার্যে তাহাদের জেহাদি উন্মাদনায় প্রাণবায়ু সরবরাহ করিয়াছে এবং করিতেছে। ধর্মনিরপেক্ষীরা ইতিহাস হইতে কোনোদিন শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। স্পেন কীভাবে ইহাদের দৌরাত্ম্য স্তব্ধ করিয়াছে, চীন ও রাশিয়া কীভাবে করিতেছে তাহার সংবাদ তাহারা রাখেন না। আর ভারতবর্ষের তথাকথিত নেতৃবর্গের তাহাতে কেনো রুচিও নাই। তাহারা ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোটব্যাংকের প্রতি লালায়িত হইয়া দেশের নিরাপত্তার বিষয়টি বরাবর দুর্লক্ষ্য করিয়াছে। তবে সুখের বিষয় হইল, ভোটভিখারি এই নেতাদের ভণ্ডামি দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ধরিয়া ফেলিয়াছেন। আরও সুখের বিষয় হইল, ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের দেশভক্ত মানুষও তাহাদেরই সমাজের এই জেহাদিপনা আর পছন্দ করিতেছেন না। সুতরাং তাহাদের সংযত হইবার সময় আসিয়াছে। ক্রান্তদর্শী কবির লেখনী মিথ্যা হইবার নহে। কেননা মানুষ চিরকাল ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। একদিন-না- একদিন তাহারা প্রকৃতস্থ হইবেই। ভারতবর্ষে তাহারা লীন হইয়া যাইবেই।

## সুভাষিতম্

*কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।*

*একৈক পক্ষে গজরাজ মুক্তা তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।।*

**কাকের চঞ্চু যদি স্বর্ণমণ্ডিত হয়, চরণযুগল যদি মণিবিজড়িত হয়, এক-একটি পালক যদি গজমোতি খচিত হয়, তথাপি সে কাকই থাকে, রাজহংস হয়ে যায় না।**

# বিশ্বাসযোগ্যতা ঠেকেছে তলানিতে, তাই গা জোয়ারি বন্ধ করুন মমতা

**নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়**

বারবার মুখ পুড়ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর শেষতম সংযোজন এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ারকে বিশ্বাস করা। ২০১২-র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁকে ডুবিয়ে ছিলেন সমাজবাদী নেতা মুলায়ম সিংহ যাদব। এবার ডোবালেন পাওয়ার।

পাওয়ারের কথাতেই আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ২১ দলের বিজেপি বিরোধী জোট ডেকেছিলেন মমতা। পাওয়ার নিজেই পিছিয়ে যান। আবার লজ্জায় পড়েন মমতা। মমতা ভেবেছিলেন প্রফুল্ল পটেল আর সুপ্রিয়া সুলেকে ঘিরে যে দুর্নীতির জট রয়েছে পাওয়ার তা উতরে যাবেন। বীতশ্রদ্ধ মমতা জোটের পরবর্তী বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন। পাওয়ারের মতো ধুরন্ধর রাজনীতিক আর জাতীয় ক্ষেত্রে বিজেপির মতো সর্বভারতীয় দলের দক্ষতার সামনে অভিষেক যে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবেন তা বলাই বাহুল্য। বিজেপি এখন তাদের রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর নাম জানায়নি। অনুমান করা হচ্ছে দ্রৌপদী মুর্মু অথবা বেঙ্কাইয়া নাইডুকে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি। চার সদস্যের মার্গদর্শক মণ্ডল থেকেও কাউকে আনা হতে পারে। লোকসভার ৫৪৩টি-র মধ্যে ৬৭টি জনজাতি আসন। অন্যদিকে পাওয়ার 'না' বলে দেওয়ায় বিরোধী জোট দিশেহারা। প্রকাশ্যে না বললেও এর জন্য সকলেই দুষছে মমতাকে। ২২ পার্টির জোট কমে ১৭ হয়ে গিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে জাতীয় ক্ষেত্রে মমতার বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে এসে ঠেকেছে।

২০১৯-এ লোকসভা ভোটে নরেন্দ্র মোদী বিরোধী ২১ দলের জোট গড়তে গিয়ে পথে বসেন মমতা। জোট ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তৃণমূলের ১২টি আসন কমে যায়। তাই ২০২২-এ খানিকটা গাজোয়ারি করেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন মমতা।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা মমতা জেনে বুঝেই গাজোয়ারি করেন। তাই ব্যর্থ হলেও তাঁর কিছু যায় আসে না। সব ক্ষেত্রে চমক দেওয়া মমতার স্বভাব। তাই সব কিছুই গোপন রাখেন। দলের কাক পক্ষীরাও জানতে পারে না। আমি নির্দিষ্টভাবে জানি মমতা বিলক্ষণ জানতেন বিজেপি বিরোধী ২২ দলের মধ্যে কারা ১৫ জুনের বৈঠকে থাকবেন না। মমতার উদ্দেশ্যই ছিল জোটের ভিতর বিজেপির সমর্থকদের প্রকাশ করে দেওয়া। আর নিজের বিশ্বাস আড়াল করে রাখা। তবে শরদ পাওয়ার যে তাঁকে ডুবিয়ে দেবেন তা বুঝতে ভুল হয়ে যায় মমতার। পরাজয় নিশ্চিত বুঝে রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়ে সরে যান পাওয়ার।

> মমতার বোঝার সময় এসেছে কেবল বিধানসভা বা লোকসভার আসন সংখ্যা দিয়ে রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা যায় না। ...বোঝাই যাচ্ছে জাতীয় ক্ষেত্রে মমতার বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে এসে ঠেকেছে।

পাওয়ারের বদলে মমতা ফারুক আবদুল্লাহ ও গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর নাম প্রস্তাব করেন। ফারুক ইতিমধ্যেই সরে গিয়েছেন। গোপালকৃষ্ণ ঝুলে রয়েছেন। ২০১২-র রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মমতা তিনটি কাল্পনিক নাম দেন। মনমোহন সিংহ, আবদুল কালাম ও সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি কারও সঙ্গে আলোচনা করেননি। তাঁর কাল্পনিক প্রস্তাবে সায় দেন মুলায়ম সিং যাদব। পরে সরে যান। শেষ পর্যন্ত ইউপিএ প্রার্থী প্রণব মুখোপাধ্যায়কেই ভোট দেয় তৃণমূল। খুব কায়দা করে মমতা জানান তাঁরা 'ব্যথিত'। অন্য কোনো যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায়নি। অগত্যা প্রণববাবুকে ভোট দিতে হয়। মমতার ছলনায় পড়ে সে সময়ের বামপন্থী দলগুলিও প্রণববাবুকে মমতার সঙ্গে ভোট দিয়েছিল।

মমতার বোঝার সময় এসেছে কেবল বিধানসভা বা লোকসভার আসন সংখ্যা দিয়ে রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা যায় না। সব শাসকের ক্ষেত্রে তা যেমন প্রযোজ্য, মমতার ক্ষেত্রেও তাই। গাজোয়ারি করেই মমতার মুখ পুড়েছিল সিঙ্গুর উন্নয়ন বিল বাতিলের মধ্যে দিয়ে। এখন পুড়ছে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ আর নানা ধরনের পাচার কেলেঙ্কারি নিয়ে। তাই গাজোয়ারি বন্ধ করুন মমতা। □

# দিল্লির টাকা, বাংলার আবাস

আমরা জানি এই ব্যাপারে আপনার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আপনি খুব ভালো নাম দিতে পারেন। আপনার তো একটা 'নামাঞ্জলি' নামে বইও রয়েছে। তাছাড়াও 'জল ধরো, জল ভরো' থেকে শুরু করে 'মাটি উৎসব' আপনার দেওয়া নামে ছড়াছড়ি গোটা বাঙ্গলা। সেই হুজুগেই আপনি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নামবদল করেছেন অনেক। তাতে সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানোর কাজটা ভালোই হয়েছে। 'স্বচ্ছ ভারত'-কে আপনি 'নির্মল বাংলা' বানিয়েছেন। বিজেপি নেতাদের মুখে যা শুনি তাতে তো আপনি নাকি কেন্দ্রের প্রায় সব প্রকল্পের নামই বদলে দিয়েছেন। কিন্তু এই যে আপনার নাম বদলানোর শিল্প সেটার সমাদর করতে পারল না কেন্দ্র। জানিয়ে দিয়েছে, আবাস যোজনায় প্রধানমন্ত্রীর নাম যুক্ত না করলে কেন্দ্র এই প্রকল্পে আর টাকা দেবে না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের পক্ষে এই মর্মে নবান্নকে দিঠিও পাঠানো হয়েছে শুনলাম। তাতে নাকি বলেছে 'বাংলা আবাস যোজনা'-কে আসল নাম 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' বলেই ডাকতে হবে। নইলে চলবে না।

এ কেমন আবদার? ২০১৬-১৭ আর্থিক বছর থেকে রাজ্যে চালু হয় বাঙ্গলা আবাস যোজনা প্রকল্প। মূলত বাড়ি না থাকলে বা মাটির বাড়ি থাকলেই প্রকল্পটির সুবিধা পান উপভোক্তারা। তা দিয়ে আপনি ভোটেও জিতেছেন। কিন্তু এখন কেন্দ্র বলছে 'চলবে না'। নামবদল নিয়ে ২০১৭ সালের ৩১ আগস্ট চিঠি দেওয়া হয় রাজ্যকে। এর পরে ২০২২ সালের ১২ মে আরও একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে। তার পরেও রাজ্যের থেকে সদুত্তর না পেয়েই নাকি এবার টাকা দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। একই সঙ্গে কেন্দ্রের নতুন প্রকল্প 'আবাস প্লাস' বাবদও রাজ্যকে কোনও টাকা দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। তার মানে বাঙ্গলার মানুষ আর এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না।

কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্যে চালানোর যে নিয়মাবলী রয়েছে, নামবদল তার পরিপন্থী। রাজ্যে আবাস যোজনার নামে 'প্রধানমন্ত্রী' বদলে 'বাংলা' করায় নিয়মভঙ্গ হয়েছে।

তাতে কী হয়েছে? এই রাজ্যের মানুষ তো গোটা দেশ পেলেও কেন্দ্রের 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের সুবিধাও পান না। তবে অনেক দেরিতে হলেও এখন কৃষকরা প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া 'সম্মান নিধি' পাচ্ছেন। কিন্তু মাটির বাড়ি আর পাকা হবে না! সম্প্রতি আপনিই জানান, এই বছরে আবাস যোজনার টার্গেট এখনও কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়নি। শুনছি, কেন্দ্র নবান্নকে যে চিঠি পাঠিয়েছে, তাতে রাজ্য 'বাঙ্গলা'র বদলে প্রধানমন্ত্রীর নাম ওই যোজনায় যুক্ত না করা পর্যন্ত নতুন টার্গেট দেওয়াও হবে না বলে উল্লেখ রয়েছে।

এটা যে হবে তা মনে হয় আপনি জানতেন। আর সেই কারণেই লোক দেখাতে সম্প্রতি দলের সাংসদদের একটি প্রতিনিধি দল দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে আবাস যোজনা বাবদ কেন রাজ্যের টাকা আটকে রাখা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এর পরেই গিরিরাজের মন্ত্রক চিঠি পাঠিয়েছে নবান্নকে। শুনছি সেটা যে হবে তা আপনার সাংসদদের আগেই বলেছিলেন মন্ত্রীমশাই। জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কেন্দ্রীয় প্রকল্প রাজ্যে চালানোর যে নিয়মাবলী রয়েছে, নামবদল তার পরিপন্থী। রাজ্যে আবাস যোজনার নামে 'প্রধানমন্ত্রী' বদলে 'বাংলা' করায় নিয়মভঙ্গ হয়েছে।

দিদি, রাজ্য বিজেপি অনেকদিন ধরেই এই অভিযোগ করে আসছিল। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নামবদল নিয়ে বার বার সরব হয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনার নামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে চিঠি লিখে নালিশও করেন। অভিযোগ ছিল, তিনটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প— প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, স্বচ্ছ ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার নাম যথাক্রমে বাংলা আবাস যোজনা, মিশন নির্মল বাংলা এবং বাংলা গ্রামীণ সড়ক যোজন বলে উল্লেখ করে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। এটা যে ইচ্ছাকৃত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা আপনিও জানতেন। কিন্তু সময় থাকতে সতর্ক হলেই পারতেন দিদি। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এই দুর্ভোগ পোহাতে হতো না। □

অতিথি কলম

স্বামীনাথন আইয়ার

# অগ্নিপথ একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ

**বর্তমান পদ্ধতি প্রয়োগ হলে সমগ্র সেনা সংখ্যা কমবে, সেই সঙ্গে কমবে বেতন ও পেনশন। এটা নিশ্চয় যারা অনাবশ্যক ও উপযুক্ত ক্ষেত্র ও জ্ঞান ছাড়াই সেনাবাহিনীকে ঢালাও নিযুক্তির জায়গা হিসেবে মনে করেন তাদের কষ্ট দেবে।**

শুধুমাত্র রেল সম্পত্তির আনুমানিক ৭০০ কোটি টাকার ক্ষতি হলো এ পর্যন্ত তিন দিনের বিক্ষোভে। বিক্ষোভ ছিল চরম মারমুখী। বহু সরকারি অফিস কাছারিও ক্ষতিগ্রস্ত। ইদানীং দেখা যাচ্ছে সরকারের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে বিরোধিতা ও তার সমাধান একশ্রেণীর মানুষ পথেই করে নিতে চায়। সিএএ থেকে বিমুদ্রীকরণ, ৩৭০ ধারা বিলোপ, কৃষি আইন বিরোধ ও তার বছরব্যাপী সাধারণ মানুষের ওপর প্রচণ্ড চাপ— সবই রাস্তা ও সরকারি সম্পত্তির চূড়ান্ত ক্ষতি সাধারণের কৌশল প্রয়োগেই নিষ্পত্তি একরকম কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সূত্রে প্রথমেই মনে রাখা দরকার ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তর কখনই একটি চাকরি দেওয়ার প্রকল্প নিয়ামক নয়। যারা মারমুখী বিক্ষোভে লিপ্ত তারা কিন্তু এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই চলেছে। ভারতকে এই মুহূর্তেই তার সেনাবাহিনীর সময়োপযোগী আধুনিকীকরণ করতেই হবে। বাড়াতে হবে সামরিক দক্ষতা ও ক্ষমতা। এক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রগুলি যেমন সাইবারওয়ার ফেয়ার, ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র এমনকী মহাকাশ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও দেশকে তৈরি হতে হবে। পদাতিক সৈন্যের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয় আছে, কিন্তু অতীতের মতো নয়। যে কারণেই সামরিক বাহিনীর একটি সামগ্রিক ঢেলে সাজার প্রয়োজনীয়তা জরুরি। আর এই লক্ষে 'অগ্নিপথ' একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অত্যন্ত উপযুক্ত পদক্ষেপ। এই প্রসঙ্গে নির্দ্বিধায় বলা যায় সরকার অগ্নিপথ সংক্রান্ত নিয়োগের যে বিস্তারিত তথ্য জারি করতে চলেছে তাতে যোগদানকারীদের জন্য প্রয়োজনমাফিক একটু-আধটু হেরফের করা যেতে পারে। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের কাছে কোনো মতেই আত্মসমর্পণের প্রশ্ন উঠতে পারে না। অর্থাৎ অতীতের ভূমি সংস্কার আন্দোলন বা কৃষি আইন বাতিলের মাধ্যমে যা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়।

চলতি ব্যবস্থায় যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন পেনশন পাবেন। ইতিপূর্বে এই সরকার আসার পর 'এক পদ এক পেনশন প্রকল্প' চালু হওয়ায় সামরিক সম্ভার কেনার খরচকে পেনশন বাবদ দেয় অর্থ ছাপিয়ে গেছে। এটা অকল্পনীয়। 'অগ্নিপথ' এই পেনশন খাতে খরচা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনবে। এর মাধ্যমে যে টাকা বাঁচবে তা উচ্চপ্রযুক্তির জ্ঞানসম্পন্ন সামরিক কর্মীর বেতন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনতে খরচ হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহর কমলেও আজকের তুলনায় বেশি দক্ষতাসম্পন্ন ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অস্ত্রবলে বলীয়ান একটি সামরিক বাহিনী তৈরি হবে। অগ্নিপথ প্রকল্পে ৪৬ হাজার 'অগ্নিবীর' নিযুক্ত হবে। যাদের মধ্যে ৩৪ হাজার সেনা ৪ বছর পরে এককালীন ২১ লক্ষ টাকা নিয়ে চাকরি ছাড়তে বাধ্য থাকবে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে চিরাচরিত সৈনিক ও অগ্নিবীরদের অনুপাত সবসময় ৫০ : ৫০ রাখা। এর ফলে সমগ্র সামরিক বাহিনীর গড় আয়ু এক ধাক্কায় বর্তমান ৩২ থেকে ২৬-এ নেমে আসবে। এটি নিশ্চিতভাবে সঠিক লক্ষ্যে পদক্ষেপ। কেননা তরুণ সৈন্যেরা আরও শারীরিকভাবে সক্ষম ও লড়াকু হবে।

এক্ষেত্রে এই নীতি কেবলমাত্র সংখ্যায় ১২ লক্ষ সেনাবাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। ভারতে অন্যান্য আধাসামরিক বাহিনী ও নাগরিক নিরাপত্তা বাহিনীতেও প্রায় ১০ লক্ষ কর্মী নিযুক্ত আছেন। এর মধ্যে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশেই কেবল সাড়ে তিন লক্ষ রয়েছেন। এঁরা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা ও অন্তর্ঘাত নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন। এর পরই সিআইএসএফে রয়েছেন দেড় লক্ষ। এঁরা সরকারি সংস্থাগুলি ও অধিগৃহীত বিভিন্ন বিভাগীয় সংস্থায় নিযুক্ত। রেলের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী আরপিএফ-এর সংখ্যা ৭৫ হাজার। অন্যদিকে অসম রাইফেল উত্তর পূর্বাঞ্চলে নিরাপত্তা রক্ষায়, বিএসএফ কর্মীরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষায় নিযুক্ত।

অন্যদিকে ইন্দো টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশ চীনের সীমান্তগুলিতে প্রহরায় আছে। নেপাল, ভুটান সীমান্তে নজরদারি করছে 'সশস্ত্র সীমা বল'। নিশ্চিতভাবেই বিভিন্ন ধরনের কাজে নির্দিষ্ট ধরনের কুশলতার প্রয়োজন পড়ে। বর্তমানে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগগুলিতে আলাদা আলাদা ভর্তির নিয়মকানুন ও তৎপরবর্তী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি মোটেই সঠিক ও দক্ষ নয়। এক্ষেত্রে গোটা পদ্ধতিতেই সরকারের খরচ অত্যন্ত বেশি পড়ে। এর ফলে নিযুক্তির সংখ্যা হয় অত্যধিক, বেতন পরিমাণ প্রচুর এবং একই সঙ্গে আজীবন পেনশন দেওয়ার দায়ও হয় বিশাল। আর আশ্চর্যজনক ভাবে সঠিক বয়সের লোক বাহিনীর সঠিক জায়গায় থাকে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আনকোরা ছেলেদের সেনাবাহিনীতে ২০ বছর বয়স হলেই নিয়োগ করা উচিত। এই সময়ই তারা শারীরিক ভাবে সর্বাপেক্ষা সক্ষম থাকে। তারা পরবর্তীকালে নিজেদের বাহিনীতে পাওয়া প্রশিক্ষণগুলি অল্প একটু ঝালিয়ে নিয়ে অনায়াসে উল্লেখিত আধা সামরিক বাহিনীগুলিতে এমনকী নাগরিক নিরাপত্তা সংস্থাগুলিতেও যোগ দিতে পারে। এই একমুখী নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রাথমিক ভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর বিভিন্ন বাহিনীর (স্থল, জল, অন্তরীক্ষ) প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের আরও

পরিশীলিত প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

প্রত্যেক নিরাপত্তাবাহিনীতেই বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন সব সময় আছে। কিন্তু তিনটি বাহিনীর প্রত্যেকটিতেই মুখোমুখি যুদ্ধ করার সৈনিকের সংখ্যা সশস্ত্র বাহিনীতেই সর্বাধিক। বর্তমান পদ্ধতি প্রয়োগ হলে সমগ্র সেনা সংখ্যা কমবে, সেই সঙ্গে কমবে বেতন ও পেনশন। এটা নিশ্চয় যারা অনাবশ্যক ও উপযুক্ত ক্ষেত্র ও জ্ঞান ছাড়াই সেনাবাহিনীকে ঢালাও নিযুক্তির জায়গা হিসেবে মনে করেন তাদের কষ্ট দেবে।

সরকারের কোষাগার থেকে অপচয়মূলক একটা বড়ো অঙ্কের খরচ যে বাঁচবে সে ব্যাপারে তাঁরা চিন্তিত নন। তাঁরা সরকারের খরচের থেকে চিন্তা করছেন রাজনৈতিক বিরোধিতার মাধ্যমে লাভ নিয়ে। প্রত্যেকটি বাহিনীর মধ্যেই থাকা কায়েমি স্বার্থও দাঁত নখ বের করে ভেতরে ভেতরে এর বিরোধিতা করবে। এ সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের নিরাপত্তার বিষয়ে একটি সংহত সিদ্ধান্ত নিয়েই এগোতে হবে যতই না নিজেদের বিষয়ে আবদ্ধ থাকা ওপরওলার কিছু লোকও সংস্কারের বিরোধিতা করুক।

কিছু কিছু সমালোচককে এখনও বলতে শোনা যাচ্ছে যে সমস্ত নতুন নিয়মিত সৈনিক মাত্র ১ বা ২ বছরের প্রশিক্ষণ পাবে তারা তো অভিজ্ঞতার নিরিখে কেবলমাত্র স্কুলের কিন্ডারগার্টেনের বাচ্চাদের মতো হবে। তারা আবার কী যুদ্ধ করবে? হায়রে! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজের ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি ২০ লক্ষ ভারতীয় সেনা নিয়োগ করেছিল। যাদের যুদ্ধ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। মাত্র ২ বছরের প্রশিক্ষণের পর তৎকালীন অপ্রতিরোধ্য জাপান বাহিনীকে তারা সম্পূর্ণ চূর্ণ করেছিল। এই যদি কিন্ডারগার্টেন ছেলে-মেয়েদের কীর্তি হয় তাহলে আমরা আরও বেশি বেশি করে কিন্ডারগার্টেন শিশুই চাইব। আর এক দল জ্ঞানী সমালোচক বলছেন অস্ত্রবিদ্যায় প্রশিক্ষিত হওয়ার পর চার বছরের মাথায় তরুণদের চাকরির বাইরে করে দিলে যেখানে এমনিতেই বেকারত্বের হার খুব বেশি সেক্ষেত্রে তারা সমাজে অপরাধ, সন্ত্রাস বা অন্যান্য ধরনের হিংসাত্মক কাজকর্মে আরও সক্ষমভাবে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এই ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি অতিরঞ্জিত ও কষ্টকল্পিত। কেন তা বলছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলি আনুমানিক ৪০ লক্ষ সেনাকে কর্মচ্যুত করে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে প্রত্যেক জায়গায় বেকারত্বের সমস্যা তৈরি হয়। কয়েক জায়গায় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শান্তিপূর্ণ ভাবেই এই সমস্যার সমাধান হয়।

আজকের দিনেও প্রত্যেক বছর প্রায় লাখ খানেক মানুষ সেনাবাহিনী ছেড়ে আসে ত্রিশ বছর বয়েসের কম-বেশিতে। সমাজে কোনো ধরনের বিক্ষোভ অশান্তি দেখা যায় না। (অবশ্যই তাদের পেনশনের নিরাপত্তা থাকে)। এখন নাগরিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রেই উভয় বড়ো ধরনের নিয়োগ হচ্ছে। এই ধরনের সেবা প্রদান ক্ষেত্রে বহু সংখ্যায় চাকরি তৈরি হচ্ছে। বাস্তবে এই ক্ষেত্রটি অন্যতম বড়ো চাকরির নিয়োগ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই সংস্থাগুলি চার বছরের সেরা সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অগ্নিবীরদের নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রগুলিতে সাদরে লুফে নেবে।

দেশে বেকারত্বের সমস্যা আজ অন্যতম জটিল সমস্যা। এই পরিস্থিতিতে তরুণরা অত্যন্ত আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধার সেনাবাহিনীতে চাকরি পাওয়ার মনোমতো সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখলে বিক্ষুব্ধ হবেই। এতে কোনো ভুল নেই। অগ্নিপথের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। বিশেষ করে তারা বেশি বিক্ষুব্ধ যারা ভাবছে নতুন বয়সের সীমা অনুযায়ী তারা আর আবেদন করতে পারবে না। বয়সের উচ্চতম সীমা কিন্তু ইতিমধ্যেই সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে সামরিক বাজেটের সীমিত অর্থ অপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ নিতান্ত প্রয়োজন নেই এমন সেনার পেছনে ব্যয় করা (তাদের সকলকে চাকরি দেওয়া) বেকার সমস্যা সমাধানের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পথ বলেই মনে হয়।

ব্যাপক দাঙ্গা লুঠতরাজের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর উন্মত্ত জনতার কাছে সরকারের তরফে বোঝানো হয় যে চার বছর পর 'অগ্নীবীররা' অসম রাইফেল, সিআইএসএফ ইত্যাদি অন্যান্য আধাসামরিক সংস্থাগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। বহু ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে। সত্যি কথা বলতে কী উন্মত্ততাকে নিরস্ত করতে যেন বলা হচ্ছে এমন শোনালেও এটি কিন্তু পরিকল্পনার মধ্যে আগেই ছিল। সংযোগের কিছুটা অভাব রয়ে গেছে। তবে সেনাবাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে সংহত করার ক্ষেত্রে ভারতের পুনরায় গভীর চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে।

*(লেখক একজন অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার)*

## শোকসংবাদ

মালদা নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য সুনীলপদ গোস্বামীর দাদা রক্ষাপদ গোস্বামী গত ১২ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, একমাত্র কন্যা ও নাতনি এবং ১ ভাই ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের রেখে গেছেন। চিকিৎসার জন্য তাঁর একমাত্র কন্যা পিয়াসা তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ট্রেনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বরেলি স্টেশনে নামিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর প্রায়বায়ু নির্গত হয়ে যায়। তিনি দ্বিতীয় বর্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক ছিলেন, সঙ্ঘের বহু দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের দায়িত্বও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। উল্লেখ্য, গত ১৪ মে তার অগ্রজ দুর্গাপদ গোস্বামী ইহলোক ত্যাগ করেছেন।


## পাত্র চাই

কলকাতা সল্টলেক নিবাসী WB ব্রাহ্মণ চট্টোপাধ্যায় কাশ্যপ গোত্র পেনশনভোগী অধ্যাপকদ্বয়ের অবিবাহিত সুশ্রী একমাত্র কন্যা প্রায় 40/5' বহুজাতিক সংস্থায় উচ্চপদে চেন্নাইতে কর্মরত বার্ষিক 24$^{+}$L, জন্ম 03/09/1982, সময় 15.32, স্থান কলকাতা, মকরলগ্ন, কুম্ভরাশি, শতভিষা নক্ষত্র, দেবারিগণ, B Pharm, PGADBM, আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যে অভ্যস্ত, এবং শাড়ির তুলনায় ফর্ম্যাল বিদেশি পোশাকে বেশি স্বচ্ছন্দ। বিবাহ পরবর্তী পর্বেও কন্যা চাকরি করবে। অবিবাহিত ব্রাহ্মণ স্বদেশে বা বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত, আয় ও শিক্ষায় কন্যার সমতুল পাত্র চাই।
যোগাযোগ : anis.saltlake@gmail.com
Mob. : 9830513598

# রাজনৈতিক ইন্ধন ছাড়া এই তাণ্ডব সম্ভব নয়

**তারক সাহা**

সামরিক বাহিনীতে একুশ বছরের কম বয়সি তরুণ-তরুণীদের নিয়োগ নিয়ে উত্তপ্ত জাতীয় রাজনীতি। নতুন এই নিয়োগ প্রকল্পের নাম 'অগ্নিপথ' ও নিয়োগপ্রাপ্তদের নাম 'অগ্নিবীর'। এ নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়ায় অজস্র চর্চা হয়েছে এবং হবে। এই বিষয় নিয়ে অহেতুক এক ভীতির পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে সেই সব তরুণ-তরুণীদের মনে যারা সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে চায়। এই প্রকল্পে যোগদানের সর্বনিম্ন বয়স সাড়ে সতেরো বছর এবং ঊর্ধ্বসীমা ২৩ বছর। আমাদের দেশে সাধারণত সাড়ে সতেরো বছরের ছেলে-মেয়েরা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে থাকে। অগ্নিপথ প্রকল্পে একজন অগ্নিবীর ন্যূনতম বয়সে যোগদান করলে চার বছর বাদে ঘোষণা মতো যদি অবসর নেয় তখন তার বয়স হবে একুশ এবং এরপর তার দরজা থাকবে উন্মুক্ত। সে যদি তার মেধা প্রদর্শন করতে পারে তবে সে সরকারের ঘোষণা মতো ২৫ শতাংশের দলে ঢুকে পড়ে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে চাকরি পেতে পারে। আর সেনাবাহিনীতে কাজ করতে না চাইলে আবার কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। এবং পরিবারের চাহিদা মতো এককালীন প্রায় ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে ছোটো ব্যবসা শুরু করতে পারে। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাড়াতে চাইলে সরকার ঋণের ব্যবস্থা ব্যাঙ্ক থেকে করে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই অগ্নিবীরদের জন্য। বিভিন্ন রাজ্য সরকার তাদের রাজ্যের পুলিশ বাহিনীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অগ্নিবীরদের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যোগ্যতার ভিত্তিতে এই সব অগ্নিবীরদের বিভিন্ন আধা সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে। সেনাবাহিনীতে চাকরি করার যে শংসাপত্র প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে পাওয়া যাবে জীবন নতুনভাবে তৈরি করার পক্ষে অমূল্য। সেনা প্রশিক্ষিত তরুণ তরুণীরা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় নিয়োগে অগ্রাধিকার পাবে কর্মনিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার জন্য।

এত কিছু সুযোগ সুবিধা রয়েছে একজন অগ্নিবীরের জন্য। তবে কীসের ভয়? সরকার বদলে গেলেও সরকারি প্রতিশ্রুতি কখনো বদলে যাবে না। এই কথাটি মনে রাখুক চাকরি প্রার্থীরা। বিরোধীদের উস্কানি ও তাদের পাতা ফাঁদে যেন পা না দেয় নতুন প্রজন্মের অগ্নিবীররা!

আজকের রাজনীতি এক ঘৃণ্য পথে আবর্তিত। ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দলের সেরকম ইস্যু নেই তাই এরা অগ্নিপথকে হাতিয়ার করতে চাইছে। না হলে গত ১৬ ও ১৭ জুন দেশের বারো রাজ্য জুড়ে যে অরাজকতা দেশের মানুষ দেখল তা কোনো ভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এক পরিকল্পিত, সংগঠিত অপরাধ যা রাজনৈতিক মদতপুষ্ট। না হলে এই তাণ্ডব নিয়ে কোনো মিডিয়ায় কোনো বিরোধী নেতাদের মুখে নিন্দা শোনা যায়নি। দুইদিনে যা ঘটনা ঘটেছে তাতে এটা একরকম স্পষ্ট এই সব ঘটনা রাজনৈতিক ইন্ধন ছাড়া সম্ভব নয়। এই ক'দিনে যে জাতীয় সম্পত্তি তছনছ করেছে দুষ্কৃতীরা তার আর্থিক ক্ষতি কয়েকশো কোটি টাকার। এই বিপুল জাতীয় সম্পত্তি কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। রাজনৈতিক নেতাদের এই অপকর্মে শামিল হলে হবু অগ্নিবীরদের সরকারি চাকরি পেতে যে অসুবিধা হবে এমন হুশিয়ারি দিয়ে রেখেছে সামরিক দপ্তর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই সরকারি সিদ্ধান্ত? সামরিক দপ্তর জানাচ্ছে এটা কোনো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নয়। বেশ কয়েক বছর পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীতে এই রকম চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ শুধু এ দেশে? না, এমনটা নয়। দুনিয়ার অনেক দেশে বিশেষ ভাবে ইজরায়েলে এই প্রথা চালু বহুদিন ধরে। সেখানে তো এরকম তাণ্ডব, ভাঙচুর হয় না।

আসলে কথা, আমাদের দেশে গণতন্ত্রের অপব্যবহার হচ্ছে। আমাদের দেশের সামরিক খাতে সরকারি ব্যয় ৫ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ খরচ হয় পেনশন ও কর্মীদের বেতন দিতে। এই বিপুল ব্যয়ভার সামাল দিতে টান পড়ছে সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণে। আমাদের পড়শী দুই দেশ চীন ও পাকিস্তান আমাদের ঘোরতর শত্রু। ২০২০ সালের চীনের বিরোধিতা আমরা ভুলে যাইনি। আজও সমস্যা মেটেনি। পাকিস্তানের কথা তো বলাই বাহুল্য। বিশ্বের কোনো দেশকে এমনভাবে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়নি। পাকিস্তানের সঙ্গে তিনটি যুদ্ধ করেছে দেশ, চীনের সঙ্গে ৬২ সালের লড়াইয়ে ভীষণ ভাবে পর্যুদস্ত হয় ভারত। তাই সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের ভীষণ জরুরি। প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তাদের মতে স্থলবাহিনীর আধুনিকীকরণ বোফর্সের পরে হয়নি। আর বিমান বাহিনীর ৩৬টি রাফায়েল বিমান ছাড়া তেমন আধুনিকীকরণ হয়নি। চীন লোক বল বা সমর সম্ভারে অন্ততপক্ষে পঁচিশ শতাংশ এগিয়ে। তাই চুক্তিভিত্তিক চার বছরের এই নিয়োগে পেনশন বাবদ ব্যয় কমে যাবে। সাশ্রয় হবে বিপুল অর্থ যা বিনিয়োগ হবে বাহিনীর আধুনিকীকরণে। রাজনৈতিক নেতারা বিলক্ষণ জানে। শুধু রাজনৈতিক পরিসর পেতে এদের এই ভণ্ডামি। □

# ধর্মনিরপেক্ষতার আমদানি হয়েছিল তুষ্টিকরণের স্বার্থে

**পিন্টু সান্যাল**

'ধর্মনিরপেক্ষতা'— শব্দবন্ধটি নিশ্চিত ভাবেই ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সর্বাধিক উচ্চারিত এবং অপপ্রয়োগ করা শব্দ। প্রত্যেক ভাষার সঙ্গে তার সংস্কৃতি জড়িয়ে থাকে, তাই প্রত্যেক ইংরেজি শব্দের যেমন একদম ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ সম্ভব নয় ঠিক তেমনি প্রত্যেক বাংলার একদম ঠিক ইংরেজি প্রতিশব্দ সম্ভব নয়। Religion-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'ধর্ম' নয়। 'ধর্ম' সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিগত ধারণা। আর Religion একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উপাসনা-পদ্ধতি। প্রত্যেক পদার্থের যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে, ঠিক তেমনি প্রত্যেক মানুষ সমাজ, প্রকৃতি, সমগ্র বিশ্বের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, একাত্ম হয়ে, যে কর্তব্য পালন করে তাই 'ধর্ম'। এর মধ্যে যুক্তি-তর্ক, সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী রীতির পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য একই থাকে, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ।

অন্যদিকে যেখানে একটিমাত্র 'মত'কে মানতে বাধ্য করা হয়, সমগ্র বিশ্বকে একটিমাত্র মতের অনুসারী করবার জন্য মানবাধিকারের লঙ্ঘন করা হয়, অন্যদের সংস্কৃতি এবং সেই সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত কয়েক হাজার বছরের জ্ঞানকে ভস্মীভূত করা হয়, তা কখনোই 'মানবধর্ম' হতে পারে না। ভারতবর্ষ তার সনাতন ধর্ম নিজের মতো প্রতিষ্ঠা করতে কখনো কোনো দেশ আক্রমণ করেনি, রক্তপাত করেনি। ভারতবর্ষে যখন শঙ্করাচার্য আসমুদ্রহিমাচল ভ্রমণ করে শাস্ত্রনির্ভর যুক্তির মাধ্যমে সনাতন ধর্মের প্রতি আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, দর্শনের নতুন চিন্তনে মানব ইতিহাস সমৃদ্ধ হচ্ছিল, সেসময় কোথাও মানব সভ্যতাকে অমানবিক, অসহিষ্ণু ঘটনাবলীর সাক্ষী হতে হয়নি।

'Religion'-এর বাংলা তাই 'উপাসনা-পদ্ধতি' হতে পারে; 'ধর্ম' নয়। সেকুলারিজমের ইংরেজি অর্থ' not connected with religious matter'। তাই সেকুলারিজমের অর্থ কখনোই 'ধর্মনিরপেক্ষতা' হতে পারে না। আরবীয় ও ইউরোপীয় 'Religion' ভারতবর্ষে প্রবেশের আগে পর্যন্ত শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, শিখ, জৈনের মতো বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি ভারতীয় ধর্মের দর্শন থেকেই পুষ্ট হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে এদের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেছে। কোথাও নিজের মত জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়নি। ইউরোপের রিলিজিয়ান এবং ভারতবর্ষের 'ধর্ম'-এর মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে বলেছেন—

''গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। ইউরোপে রিলিজন বলিয়া যে শব্দ আছে ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব; কারণ, ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে— আমাদের বুদ্ধি- বিশ্বাস-আচরণ, আমাদের ইহকাল- পরকাল, সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম। ভারতবর্ষ তাহাকে খণ্ডিত করিয়া কোনোটাকে পোশাকি এবং কোনোটাকে আটপৌরে করিয়া রাখে নাই। হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়— বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয়দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম, তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে; তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই— ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।''

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম কি?' প্রবন্ধ থেকেও 'ধর্ম' আর 'রিলিজিয়ান'- এর বিভেদ স্পষ্ট হয়।

ভারতবর্ষীয় সমাজ, রাষ্ট্র, এমনকী ব্যক্তিগত জীবন যে সমস্ত নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হতো, তাকেই 'ধর্ম' বলা হতো।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে—

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম লক্ষণম্।।'

অর্থাৎ ধৈর্য, ক্ষমা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, চুরি না করা, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয় সংযম, ধী (জ্ঞানেরও অধিক), বিদ্যা (পরা ও অপরা), সত্য এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।

আবার,

'যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ'

অর্থাৎ যে ব্যবস্থা আমাদের আকাঙ্ক্ষাগুলির লাগাম টেনে ধরতে সক্ষম করে তোলে, উৎসাহ জোগায়, চরম ভোগের মধ্যে জীবনযাপন করলেও যে ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে সেই স্বর্গীয় আনন্দ বা পরম সত্যকে উপলব্ধির যোগ্যতা এনে দেয় তারই নাম 'ধর্ম'।

ধর্মের সঙ্গে যুক্ত সামাজিক দিকটি হলো—

'ধারণাৎ ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্ম ধারায়তি প্রজাঃ'

অর্থাৎ যে শক্তি ব্যক্তিসমূহকে একত্রে আনে এবং সমাজ রূপে তাদের ধরে রাখে তারই নাম ধর্ম।

এই দুই সংজ্ঞাকে জুড়লে দেখা যায় ধর্ম স্থাপনের অর্থ হলো এমন একটা সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক জীবন গড়ে তোলা যেখানে

প্রত্যেকেই এই সমাজের অপরাপরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবে, অন্যের পার্থিব জীবনকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও সুখী করে তোলার জন্য ত্যাগের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হবে এবং সেই আধ্যাত্মিক জীবনকে বিকশিত করবে যা পরম সত্যের উপলব্ধির অভিমুখী হয়।

'ধর্ম' প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'অন্যান্য জাতির পক্ষে ধর্ম— সংসারের অন্যান্য কাজের মতো একটা কাজ মাত্র। রাজনীতি-চর্চা আছে, সামাজিকতা আছে, ধন ও প্রভুত্বের দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহা আছে, ইন্দ্রিয়নিচয় যাহাতে আনন্দ অনুভব করে, তাহার চেষ্টা আছে। এই সব নানা কার্যের ভিতর এবং ভোগে নিস্তেজ ইন্দ্রিয়গ্রাম কিসে একটু উত্তেজিত হইবে— সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে একটু-আধটু ধর্মকর্মও অনুষ্ঠিত হয়। এখানে— এই ভারতের কিন্তু মানুষের সমগ্র চেষ্টা ধর্মের জন্য; ধর্মলাভই তাহার জীবনের একমাত্র কার্য।' (স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড)

ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি, বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন তাঁর একটি প্রবন্ধ 'Dharma : The Individual And The Social Order in Hinduism'-তে ভারতবর্ষের 'ধর্ম' প্রসঙ্গে বলেছেন, 'Dharma tells us that while our life is in the first instance for our own satisfaction, it is more essentially for the community and most of all for that universal self which is in each of us and all beings. Ethical life is the means to spiritual freedom, as well as its expression on earth.' ধর্মানুরাগী রাধাকৃষ্ণনের 'The Hindu View of life', 'Religion & Society' ইত্যাদি বইতে এই ভাবই প্রাধান্য পেয়েছে যে, যাই আমাদের সমাজ সংস্কারের পরিকল্পনা হোক, রাজনীতি বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের প্রচেষ্টাই আমরা করি না কেন, কোনও কিছুই সফল হবে না যদি না তার পিছনে ধর্মের প্রেরণা থাকে। সংবিধান খসড়া কমিটির প্রধান ড. বি আর আম্বেদকর সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়নি। তাই ভারতীয় সংবিধানের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে 'ধর্ম' থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রয়াস তিনি করেননি।

ভারতীয় সংবিধানের প্রথম সংস্করণের বিভিন্ন পাতায় শান্তিনিকেতনের শিল্পী রামমনোহর সিনহা ও নন্দলাল বসুর হাতে আঁকা বিভিন্ন চিত্র রাষ্ট্রপরিচালনার সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় ধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। যেমন নাগরিকদের মূল কর্তব্য যে পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, সেখানে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ ত্রয়ীর ছবি আছে। এ থেকেই প্রমাণিত সংবিধান প্রণেতারা রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য এবং ব্যক্তির অধিকার সুনিশ্চিত করতে ভারতীয় ধর্মকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অগণতান্ত্রিক ভাবে জরুরি অবস্থা জারি করে সংবিধানে 'সেকুলার' কথাটি যুক্ত করেন। রাষ্ট্রপরিচালনায় চার্চের আধিপত্য কমাতে ইউরোপে সৃষ্ট 'সেকুলার' শব্দটি ভারতবর্ষে আমদানি করা এক নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সাময়িক উন্নতিতে প্রভাবিত হয়ে তাদের অন্ধ অনুকরণ বিষয়ে সাবধান করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে বলেছেন 'বস্তুত প্রত্যেক সভ্যতারই একটি মূল আশ্রয় আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত কি না তাহাই বিচার্য। যদি তাহা উদার ব্যাপক না হয়, যদি তাহা ধর্মকে পীড়িত করিয়া বর্ধিত হয়, তবে তাহার আপাত-উন্নতি দেখিয়া আমরা তাহাকে যেন ঈর্ষা এবং তাহাকেই একমাত্র ঈপ্সিত বলিয়া বরণ না করি।'

'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটিকে তুষ্টিকরণের জন্য স্বাধীনতার আগে ও পরে ভারতীয় রাজনীতিতে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র গোলকধাঁধায় ফেঁসে, সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণে ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত পাঠকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হলো।

শুধু তাই নয়; সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির উদারভাবের সুযোগ নিয়ে এমন একটি মতবাদের সঙ্গে আপোশ করা হয়েছে বারবার, যা অন্যমতের সঙ্গে কোনো কালে, কোনো দেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী নয়, শুধুমাত্র সংখ্যার জোরে সারা পৃথিবীতে নিজস্ব মত-প্রতিষ্ঠাই যার চরম লক্ষ্য। এই ধরনের আপোশ সরাসরি ভারতবর্ষের অন্য মত গ্রহণের, যুক্তি দ্বারা মত প্রতিষ্ঠার অভ্যাসকেই কুঠারাঘাত করে।

১৯১৯ সালে গান্ধীজীর খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করা— এরকমই একটি আঘাত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভারতবর্ষের 'ধর্ম' থেকে বিচ্যুত হওয়ার সেই শুরু। এরপর 'ভারতমাতা'র বন্দনা যা স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর যুবকদের আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করতো, সেই 'বন্দেমাতরম্' সংগীত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সম্পূর্ণ গাওয়া নিষিদ্ধ হলো ১৯৩৭ সালে, শুধুমাত্র সেই অসহিষ্ণু মতবাদের সঙ্গে আপোশ করতে। বলা যায়, জাতীয় কংগ্রেস 'বন্দেমাতরম্'কে খণ্ডিত করে যে অধার্মিক পথে নিজেদের গতি অব্যাহত রাখলো তারই শেষ পরিণতি মুসলিম লিগের সঙ্গে আপোশ করে 'ভারত-ভাগ'।

মানব ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েই তৎকালীন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ৩৭০-ধারার মতো মানবাধিকার বিরোধী একটি ধারা সংবিধানে সংযোজন করে কাশ্মীরি হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও পরে পলায়নের জমি প্রস্তুত করে।

কিন্তু দেরিতে হলেও ভারতবর্ষের পুনরায় ধর্মপথে চলা শুরু হয়েছে। ৩৭০ ধারা বাতিল, তিন তালাক বাতিল ও প্রতিবেশী দেশের অত্যাচারিত সংখ্যালঘু হিন্দু ও অন্যান্য উপাসনা পদ্ধতির মানুষদের আশ্রয়দানের জন্য নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাম মন্দির পুনর্নির্মাণে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছে। সারা বিশ্ব 'বিশ্ব যোগ দিবস' পালন করে ভারতবর্ষের ধর্মের ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। অনুন্নত দেশগুলিতে বিশল্যকরণীর মতো করোনা মহামারীর ভ্যাকসিনের জোগান দিয়ে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের মন্ত্র 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' সারা বিশ্বে ধ্বনিত হয়েছে, ভারতবর্ষ বিশ্বকে দেখিয়েছে তাঁর 'রাষ্ট্রধর্ম'। সমগ্র বিশ্বের আস্থা অর্জনে সফল বর্তমান ভারত তাই ধর্মের পথে অবিচল থেকেই শান্তি ও মৈত্রীর বাণী নিয়ে নিজেকে বিশ্বগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। □

# আগামী তিরিশ বছরেই কলকাতার সলিল সমাধি

## বিজ্ঞানীরা বলছেন, কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা শহরগুলোতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য জলবায়ু আইনের মাপকাঠিগুলো সঠিক ভাবে মানা হয়েছে কিনা দেখেই নতুন কোনো পরিকাঠামোকে ছাড় দেওয়া উচিত। নচেৎ নয়।

**হীরক কর**

হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন, আপনার-আমার জীবদ্দশাতেই কলকাতা চলে যাবে জলের নীচে। অর্থাৎ আমরা আশি বছর বয়স অবধি বাঁচলে আমাদের দেখতে হবে কলকাতার সলিল সমাধি। এমনকী এই গরমে আপনি যদি ছ' ঘণ্টার বেশি সময় বাইরে কাটান আপনার হৃদযন্ত্রটি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। আর এই সবের জন্য বিজ্ঞানীদের কাছে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'। এবং অতি দ্রুত 'ক্লাইমেট চেঞ্জিং' বা 'আবহাওয়া পরিবর্তন'। ইন্টার গভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্ল্যাইমেট চেঞ্জ বা আইপিসিসি-র ষষ্ঠ অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট (এ আর ৬)-এর দ্বিতীয় অংশ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। যে রিপোর্টে ভারত জুড়ে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে অশনিসংকেত দেওয়া হয়েছে।

সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠার বেশি এই রিপোর্টে কলকাতা, সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গ নিয়ে যে সতর্কতার কথা বলা হয়েছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো। আইপিসিসি প্যানেলে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা জলবায়ু বিজ্ঞানী ড. অঞ্জল প্রকাশ এই ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আগামীদিনে আবহাওয়া পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।

তাঁর ধারণা, আমাদের জীবনে আমফানের প্রভাব পড়েছে মারাত্মক ভাবে। ১৯৯৯ সালের পর 'আমফান' ছিল বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া প্রথম সুপার সাইক্লোন। এবং গত একশো বছরে পশ্চিমবঙ্গের ওপর আছড়ে পড়া সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়ের নাম আমফান। প্রবল শক্তিশালী হওয়ার পরও পশ্চিমবঙ্গের ওপর 'আমফান' যতটা ক্ষয়ক্ষতি করতে পারতো তার চেয়ে হয়েছিল কিছুটা কম। তার কারণ, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য। ম্যানগ্রোভ এই ঝড়ের গতি অনেকটা কমিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তার মূল্য চোকাতে হয়েছে সুন্দরবনকে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয় প্রায় ১৬০০ বর্গ কিলোমিটার ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হয়েছিল আমফানের জন্য। একই সঙ্গে কলকাতার সবুজের অনেকাংশ ধ্বংস হয়ে যায় আমফানের প্রভাবে। আনুমানিক ১০ হাজার ২০০ কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছিল আমফানের জন্য। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা জুড়ে প্রায় ২৪ লক্ষ মানুষ ভিটেমাটি হারা হয়েছিলেন। পাশাপাশি প্রশাসনের তরফ থেকে ঝড়ের আগে ৮ লক্ষ মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আমফানের মতো সুপার সাইক্লোন তৈরি হওয়ার পেছনে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি

*কলকাতার রাস্তায় জমা জলে প্রায় ডুবে যেতে বসেছে আস্ত গাড়ি।*

অন্যতম প্রধান কারণ। এবং তার সঙ্গে সেই সময় কোভিড-১৯- এর জেরে লকডাউন চলতে থাকায় অ্যারোসলের বৃদ্ধি এবং সমুদ্রের উপর মেঘ জমতে থাকা আরেকটি কারণ। ড. অঞ্জল প্রকাশের মতে, বহুমুখী বিপদের আশঙ্কা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গবাসীর। বহুমুখী বিপদ বলতে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, ভূমিধস ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কলকাতা-সহ টোকিয়ো, ওসাকা, করাচি, ম্যানিলা, তিয়ানজিন ও জাকার্তার মতো শহর এই ছ'টি বিপদের মুখোমুখি হতে চলেছে। এইসবহ মেগাসিটিগুলোতে বর্তমানে সম্মিলিতভাবে ১৪৩ মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। এইসব নাগরিক ভবিষ্যতে ব্যাপক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হতে চলেছেন।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে পুরো মাত্রায়। আইপিসিসি রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছে কলকাতায় প্রতি বছর গড়ে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি গরম অনুভূত হবে। এ রাজ্যে ব্যাপক খরা পরিস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। শহরাঞ্চলে মাটির তলার জলের পরিমাণ (ড্রাই ল্যান্ড) দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রিপোর্টে ২০০০ সাল থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে এশিয়ার বহু শহরে ড্রাই ল্যান্ড ব্যাপক হারে বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উপমহাদেশের কলকাতা-সহ আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ মেগাসিটি রয়েছে। সেগুলি হলো দিল্লি ও করাচি। রিপোর্টে বলা হয়েছে ৩ লক্ষের বেশি বসবাস করে এরকম ৩৩০টি শহরে সব মিলিয়ে ৪১১ মিলিয়ন মানুষ এই সমস্যার মুখোমুখি হতে চলেছেন।

বন্যার কবলে পড়তে চলেছে বহু মহানগর। আইপিসিসি-র রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর বৃহত্তম ২০টি মহানগর ব্যাপক ভাবে বন্যার কবলে পড়তে চলেছে। এই ২০টি শহরের মধ্যে ১৩টি এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। এর মধ্যে ন'টি শহর এরকম রয়েছে যেগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে হয়তো বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। এই ৯টি শহর হলো কলকাতা, গুয়াংজু, তিয়ানজিন, হো চি মিন সিটি, জাকার্তা, ঝানজিয়াং, ব্যাংকক জিয়ামেন ও নাগোয়া।

এছাড়াও, বাড়তে পারে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা। এই রিপোর্ট বলছে বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে, আমফানের মতো শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের পুনরায় মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলো-সহ কলকাতার। একই রকম বিপদ সংকেত রয়েছে মুম্বাই মহানগরীর জন্যেও।

সুন্দরবনের ওপর প্রভাব পড়তে চলেছে ব্যাপক ভাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সুন্দরবনের নীচু অঞ্চল এবং ছোটো ছোটো দ্বীপগুলোতে লবণাক্ত সামুদ্রিক জলের প্রবেশ ঘটবে বলে মনে করা হয়েছে আইসিসির ওই রিপোর্টে। ফলে সুন্দরবনের বড়ো অংশের বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর জেরে সুন্দরবন জুড়ে বর্তমান অর্থনীতি বা মানুষ যেসব উপায়ে নিজেদের জীবন-জীবিকা নির্বাহিত করে থাকেন সেগুলো ধীরে ধীরে অনুৎপাদনশীল হয়ে উঠবে। ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন হতে পারে বলে রিপোর্টে মনে করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের ওপরেও প্রভাব ফেলবে এই জলবায়ু পরিবর্তন। ইতিমধ্যেই দার্জিলিঙে জেলার বিভিন্ন অংশে বায়োলজিক্যাল বহু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন বিজ্ঞানীরা। মনে করা হচ্ছে, এর কারণ হলো জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণ। হিমবাহ অধিক মাত্রায় গলার ফলে উত্তরবঙ্গের নদীগুলোতেও প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছে এর প্রভাব ভবিষ্যতে মারাত্মক হতে পারে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে কলকাতার মতো শহরগুলো কীভাবে বারবার প্রভাবিত হচ্ছে তার ওপর এবারের আইপিসিসি-র রিপোর্টে বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতার মতো শহরগুলোতে উষ্ণতা, বিশেষ করে আর্দ্রতার প্রভাব আগামীদিনে আরও বেশি করে অনুভূত হবে। একইসঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে, যার প্রভাব মহানগরে ব্যাপকভাবে পড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে আর্দ্রতাজনিত কষ্ট বাড়বে। এ রাজ্যে আর্দ্রতাজনিত কষ্ট বৃদ্ধির কথা আইপিসিসি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। Wet-bulb temperature measure প্রযুক্তির হিসাব অনুযায়ী ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা একজন সুস্থ সবল মানুষের পক্ষে যথেষ্ট দূষণীয় হয়ে উঠতে চলেছে। কেননা, তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি হলেও অনুভূত হবে ৫০ ডিগ্রির মতো। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি হওয়ায় প্রচণ্ড ঘাম হবে এবং জল পিপাসা বৃদ্ধি পাবে।

রিপোর্ট বলছে, ওই তাপমাত্রায় ছায়ার মধ্যে থাকা একজন সুস্থ সবল মানুষও অস্বস্তি বোধ করবেন। তাপমাত্রা যদি ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় এবং তাতে কোনও মানুষ টানা ছয় ঘণ্টার বেশি সময় থাকলে তার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার জন্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি (Heat stress) মানুষের কাছে গুরুতর স্বাস্থ্য সংকট (Critical Health Threshold) হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রের দিকে তাকাই তাহলে বুঝতে পারা যায় যে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতাজনিত এই সমস্যাটি প্রত্যাশিত এবং স্বাভাবিক। যদি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বড়ো বিপদ ডেকে আনতে পারে।

আইপিসিসি রিপোর্টে বলা হয়েছে, হিমালয়ের হিমবাহ গলার প্রভাব উত্তরবঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে। অতিরিক্ত হিমবাহ গলার ফলে উত্তরবঙ্গের নদীগুলোতে জলের চরিত্র পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উত্তরবঙ্গের ইকোসিস্টেম ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুন্দরবনের ব-দ্বীপ অঞ্চলগুলো পরিবেশগত ভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল। খুব তাড়াতাড়ি সুন্দরবনকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন।

কী ধরনের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন? তারও উপায় বাতলেছেন বিজ্ঞানীরা। ড. অঞ্জল প্রকাশের মতে, রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত জটিল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আগামী দশ-পনেরো বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এখনই কাজ শুরু করতে হবে। কলকাতা শহর জুড়ে সবুজ-নীল পরিকাঠামো তৈরি করায় জোর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সবুজ পরিকাঠামো বলতে বোঝায় শহরজুড়ে সবুজায়ন। আর নীল পরিকাঠামো বলতে বোঝায় শহরজুড়ে জলাশয় লেক, নদী সুরক্ষিত করা। যাতে শহরের জীববৈচিত্র্য সুরক্ষিত থাকতে পারে, তার দিকে জোর দেওয়া হলো নীল-সবুজ পরিকাঠামো।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা-সহ অন্যান্য জেলা শহরগুলোতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য জলবায়ু আইনের মাপকাঠিগুলো সঠিক ভাবে মানা হয়েছে কিনা দেখেই নতুন কোনো পরিকাঠামোকে ছাড় দেওয়া উচিত। নচেৎ নয়।

# ইউরোপের রেনেসাঁ কি ভারতীয় সভ্যতার পুনর্জন্ম?

**সুদীপ নারায়ণ ঘোষ**

**পর্ব-২**

**রেনেসাঁর বিভিন্ন দিক**

**রেনেসাঁ আর্ট**

আগের পর্বে বলেছি রেনেসাঁ শিল্প ধ্রুপদী শিল্প দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। শিল্পীরা গ্রিক এবং রোমান ভাস্কর্য, চিত্রকলা এবং অলংকরণ শিল্প থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। উপরন্তু ওই শিল্পকলা রেনেসাঁর মানবতাবাদী দর্শনের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। ধ্রুপদী ও রেনেসাঁ শিল্প উভয়ই মানুষের সৌন্দর্য ও স্বভাবের উপর জোর দিয়েছিল। ধর্মীয় কাজেও মানুষ আবেগময় জীবন উপভোগ করে বলে চিত্রিত করা হলো। দৃষ্টিকোণ, তৎসহ আলো ও ছায়ার কলাকৌশল উন্নত হলো; এবং চিত্রাঙ্কন আরও ত্রিমাত্রিক এবং বাস্তবসম্মত হয়েছিল।

পৃষ্ঠপোষকরা সফল রেনেসাঁ শিল্পীদের জন্য কাজ করা এবং নতুন কৌশল বিকাশ করা সম্ভব করে তোলে। মধ্যযুগে ক্যাথলিক চার্চ বেশিরভাগ শিল্পকর্ম পরিচালনা করেছিল এবং রেনেসাঁর সময়েও তা বজায় রেখেছিল, তবে ধনী ব্যক্তিরাও গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। মেডিসি পরিবার মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, বত্তিচেল্লি, দা ভিঞ্চি এবং রাফায়েলের মতো শিল্পীদের সমর্থন জোগাত। মেডিসি পরিবারে জন্ম পোপ দশম লিও-র; তিনি দারুণভাবে শহরটিকে ধর্মীয় আবাস ও শিল্পকলা দিয়ে সাজিয়েছিলেন। ১৪৯০ থেকে ১৫২০ পর্যন্ত তা চলেছিল ও রেনেসাঁর শিখর নামে পরিচিত হয়েছিল।

**রেনেসাঁ সংগীত**

শিল্পের মতোই রেনেসাঁয় বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবনও সম্ভব হয়েছিল কারণ ক্যাথলিক চার্চ ছাড়া অন্যান্যরা পৃষ্ঠপোষকতা করত। নতুন প্রযুক্তির ফলে হাপসিকর্ড ও বেহালা জাতীয় বেশ কয়েকটি নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছে। মুদ্রণ যন্ত্রও সংগীত প্রচারে সাহায্য করেছিল। রেনেসাঁ সংগীতেও মানবতাবাদী বৈশিষ্ট্য ছিল। সুরকাররা সংগীত বিষয়ক ধ্রুপদী গ্রন্থ পড়ে শ্রোতাদের আবেগ মিশিয়ে সংগীত রচনা করতেন। তাঁরা গানের কথা জীবনমুখী করেন ও সংগীত ও কবিতা পরস্পর ঘনিষ্ঠ বলে মনে করতেন।

**রেনেসাঁ সাহিত্য এবং থিয়েটার**

রেনেসাঁ সাহিত্যও মানবতাবাদী থিম এবং ট্র্যাজেডি ও কমেডির ধ্রুপদী প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যের আদর্শে ফিরেছিল। এর ভালো উদাহরণ শেক্সপিয়ারের সাহিত্যকর্ম। মানুষের কথা, জীবনের অধর্মীয় তাৎপর্য ও মানুষের যথার্থ প্রকৃতির বিশ্লেষণ সাদরে বরণ করা হয়েছিল, হ্যামলেট এইরকমই একজন রেনেসাঁ শিক্ষিত মানুষ। মুদ্রণ যন্ত্র জনপ্রিয় নাটক প্রকাশ করে ইউরোপ তথা বিশ্বজুড়ে পুনরায় হাজির করতে সাহায্য করে। প্রকাশকরা জনপ্রিয় নাটক ও তার লেখকদের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতেন।

**রেনেসাঁ সমাজ ও অর্থনীতি**

রেনেসাঁর সময় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তন ছিল-- সামন্তবাদের পতন এবং পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির উত্থান।

বর্ধিত বাণিজ্য এবং ব্ল্যাক ডেথে বিপুল মৃত্যুর কারণে শ্রমিকের ঘাটতির ফলে সাধারণ কৃষক এবং কারিগরদের মজুরি দ্বিগুণ এবং তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল। এবং তদবধি স্বীকৃত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা আগের সামাজিক মর্যাদা হারিয়েছিল।

শ্রমিকরা মজুরি এবং ভালো জীবনযাত্রার দাবি করতে পারত এবং তাই দাসত্বের অবসান ঘটেছিল।

শাসকরা বুঝতে শুরু করেছিল যে তারা চার্চ ছাড়াই তাদের ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে। রাজার সেবার জন্য আর কোনো নাইটের বা জমিদার প্রভুর সেবায় কৃষকের দরকার ছিল না। আনুগত্যের চেয়ে অর্থ থাকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

তাই এই পরিবর্তন পোপদের হতাশ করেছিল। ১৬৪৮ সালে স্বাক্ষরিত 'ওয়েস্টফালিয়ার শান্তি' চুক্তি পোপের পক্ষে ইউরোপীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা কঠিন করে তোলে। তাই ক্ষিপ্ত পোপ দশম ইনোসেন্ট প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে এটা 'বাতিলযোগ্য, অকার্যকর, অবৈধ, অসম, অন্যায়, ঘৃণার্হ, নিন্দনীয়, অন্তঃসারশূন্য এবং সর্বকালের জন্য অর্থহীন'।

**রেনেসাঁ ধর্ম**

ব্ল্যাক ডেথ, বাণিজ্যের উত্থান, মধ্যবিত্তের বিকাশ এবং রোম থেকে অ্যাভিগননে পোপতন্ত্রের অস্থায়ী স্থানান্তর (১৩০৯ থেকে ১৩৭৭)-সহ বেশ কয়েকটি কারণে ১৫ শতকের শুরুতে ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল। ধ্রুপদী সাহিত্যের পুনরুত্থান এবং রেনেসাঁ মানবতাবাদের উত্থান ধর্মের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং পোপতন্ত্রের সর্বময় কর্তৃত্ব খর্ব করেছিল। মানবতাবাদ এমন এক পরিবেশ তৈরি করেছিল যা বিভিন্ন আন্দোলন ও সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়। মার্টিন লুথার ক্যাথলিক চার্চের সংস্কারের উপর জোর দিয়ে স্বজনপোষণ বা প্রশ্রয় দানের মতো কু-অভ্যাসগুলো দূর করতে চেয়েছিলেন।

ছাপাখানার সাহায্যে ল্যাটিন ছাড়াও

অন্যান্য ভাষায় বাইবেলের প্রচারের সুযোগ মেলে। সাধারণ মানুষ এখন ধর্মগ্রন্থ পড়তে সক্ষম হয়েছিল, যার ফলে ইভানজেলিকাল আন্দোলন হয়। এই প্রারম্ভিক ইভানজেলিকালরা গির্জার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার পরিবর্তে ধর্মগ্রন্থের উপর জোর দিয়েছিল এবং বিশ্বাস করত যে মুক্তি আসে ব্যক্তিগত রূপান্তর থেকে, শিল্প বা স্থাপত্য থেকে; কোনো ধর্মীয় প্রশ্রয় থেকে নয়।

**রেনেসাঁ ভূগোল**

বিশ্ব সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী এবং বাণিজ্য পথ উন্নত করতে আগ্রহী অভিযাত্রীরা নতুন দেশ আবিষ্কারে নানা অভিযান পরিচালনা করেছেন। কলম্বাস ১৪৯২ সালে ভারত আবিষ্কারের চেষ্টায় আমেরিকার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান ১৫০০-এর প্রথম দিকে সফলভাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

তবে পশ্চিম গোলার্ধে আমেরিকার মানুষের পক্ষে ইউরোপীয় এই অন্বেষণ এবং উপনিবেশ স্থাপন বিপর্যয়কর হয়েছিল। ইউরোপীয়রা যে রোগগুলো নিয়ে এসেছিল তার বিরুদ্ধে এখানকার আদি অধিবাসীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল না, আদি জনগোষ্ঠী প্লেগে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল, কিছু এলাকায় মৃত্যুর হার ৯০ শতাংশ ছিল পর্যন্ত বলে অনুমান। স্পেনীয়রা ইনকা সাম্রাজ্য জয় করে, জীবিত স্থানীয়দের দাস হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করেছিল। ইউরোপীয় শক্তগুলিও আফ্রিকায় আরও অভিযান চালিয়ে সেই মহাদেশের কিছু অংশ জয় করে উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে। ইউরোপীয়রা আফ্রিকা থেকে লোকেদের দাস হিসেবে কাজ করতে নিয়ে যেতে শুরু করে ক্যারিবিয়ান এবং দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলোতে। এই ক্রীতদাস বাণিজ্য শেষ পর্যন্ত বর্তমানের আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

**রেনেসাঁ বিজ্ঞান**

পণ্ডিতরা ধ্রুপদী রচনাবলী অধ্যয়ন করে প্রাচীন এই গ্রিক বিশ্বাসকে পুনরুত্থিত করেছিলেন যে সৃষ্টি নিখুঁত আইন এবং যুক্তিশৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছিল— খ্রিস্টান ধর্মের বিপরীত এই ধারণা। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, অস্থিবিদ্যা ও ঔষধবিদ্যা, ভূগোল এবং স্থাপত্যের অধ্যয়ন বৃদ্ধি পেয়েছিল, প্রাচীন গ্রিকরা যেভাবে সেগুলো অধ্যয়ন করত সেইভাবে।

রেনেসাঁর প্রধান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর মধ্যে একটা পোলিশ গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাসের থেকে এসেছে। ১৫৩০-এর দশকে, তিনি সৌরজগতের কেন্দ্রে পৃথিবী নয়, সূর্য আছে বলে দাবি করেছিলেন। ক্যাথলিক চার্চ কোপার্নিকাসের বই ছাপানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তাঁর মৃত্যুর পর এটা প্রকাশিত হয় ও তাঁর বৃদ্ধা মাকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অর্থাৎ সব যুগান্তকারী আন্দোলনের মতো এক্ষেত্রেও দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে নিরন্তর লড়াই চলেছিল, না হলে তার এত গুরুত্ব থাকত না। সহজে কিছুই অর্জিত হয় না। এটা ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা বড়ো অগ্রগতি।

অভিজ্ঞতাবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা অনুসরণ করতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরা অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা দ্বারা চালিত হয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জগতকে অনুসন্ধান করতে শুরু করেছিল। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্যের এটা ছিল প্রথম ইঙ্গিত। তারা দুটি পৃথক ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল, বিজ্ঞানী এবং খ্রিস্টান গির্জার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছিল এবং বিজ্ঞানীদের নির্যাতিত হতে হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের কাজকে দমন করা হয়েছিল বা তাদেরকে দানব রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং ডাইনীবিদ্যায় জড়িত বলে অভিযুক্ত করে বন্দিও করা হতো।

গ্যালিলিও গ্যালিলি টেলিস্কোপ উন্নত করেছিলেন, নতুন মহাকাশীয় বস্তু আবিষ্কার করেছিলেন এবং কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের অনুকূলে সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি পেন্ডুলাম ও পতনশীল বস্তুর গতিসূত্র আবিষ্কার করে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যা মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে আইজ্যাক নিউটনের আবিষ্কারের পথ তৈরি করেছিল। ক্যাথলিক চার্চ তাকে তার জীবনের শেষ ন'বছর বন্দি করে নির্যাতন চালায়।

এই যুগ উচ্চ প্রযুক্তির দ্যোতক হয়ে উঠেছিল। মন্দের ভালো এই যে প্লেগের বছরগুলো ক্রসবো, চিকিৎসাসংক্রান্ত নতুন ধারণা, বন্দুক, ঘড়ি, চশমা এবং সাধারণ জ্ঞানের জন্য নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে। এবং তাই এই ভয়ানক তাণ্ডবের শেষে মানুষের জীবন রঙিন হয়ে উঠেছিল। এই ভয়াবহ ১৫০ বছরের সর্বশেষ নতুন প্রযুক্তি ছিল মুদ্রণ যন্ত্র।

**রেনেসাঁ উৎসব**

যেসব উৎসব রেনেসাঁর সময়েই সংঘটিত হয়েছিল— ১৫৪৭ থেকে ১৫৫৯ সালের মধ্যে ফ্রান্সের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় হেনরি, তাঁর শাসনকালে নাটকাভিনয়, কুচকাওয়াজ ছিল। কখনও কখনও রানির রাজ্যাভিষেক বা সামরিক বিজয়ের মতো এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্য এই উৎসবগুলো আয়োজন করা হতো।

**কীভাবে পুনর্জাগরণ বিশ্বের পরিবর্তন করেছিল**

রেনেসাঁ ছিল প্রাচীন বিশ্ব থেকে আধুনিক রূপান্তরের একটা যুগ এবং এটা আলোকায়নের যুগের জন্মের ভিত তৈরি করেছিল। বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন, বাণিজ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সমাজে স্থায়ী ছাপ ফেলে এবং আমাদের আধুনিক সংস্কৃতির অনেক উপাদানের জন্য মঞ্চ তৈরি করে। ব্ল্যাক ডেথ শিল্পে বাস্তববাদকে শক্তিশালী করেছে। নরকের ভয় ভীষণ বাস্তব হয়ে ওঠে এবং খ্রিস্টধর্মের স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দূরবর্তী বলে মনে হয়। দরিদ্র এবং ধনী একযোগে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল।

যাই হোক অখ্রিস্টান প্রাচীন গ্রিক ও অন্যান্য ইউরোপীয় সভ্যতার আত্তীকরণ ইউরোপে রেনেসাঁ ঘটিয়েছিল আর তা সেখানে উন্নয়নের জোয়ার এনেছিল। খ্রিস্টত্বের জোরে নয় বরং তাকে অস্বীকার করে খ্রিস্টপূর্ব ধ্রুপদী সভ্যতাকে আঁকড়ে ধরে ইউরোপ এগিয়েছিল। আর এই ধ্রুপদী সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতারই প্রসারিত রূপ। সুতরাং শেষ জয় আদি সনাতন ভারতীয় সভ্যতার যার প্রতিনিধি আজকের ভাষায় যাকে আমরা হিন্দু নামে চিনি। □

# বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় প্রাণ বলিদান দিয়েছেন যাঁরা

**নিমাই চাঁদ গুঁই**

১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর স্টেশনে ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অসম পুলিশের গুলিতে একজন মহিলা-সহ এগারো জন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন বাংলা তথা মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে। বর্তমান সেই স্টেশনটির নাম 'ভাষা শহিদ' স্টেশন। বরাকের মানুষ ২০০৫ সালে জোরালো দাবি তোলায় এই নামকরণ করা হয়। অবিভক্ত ভারতবর্ষে ১৮৭৪ সালে ব্রিটিশ সরকার ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও পার্বত্য এলাকার কিছু অঞ্চল নিয়ে পৃথক একটি অসম প্রদেশ গঠন করে। অসম প্রদেশের করিমগঞ্জ জেলা ও কাছাড় জেলা নিয়ে যে ভূভাগ সেটাই বরাক উপত্যকা নামে পরিচিত।

১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বরাক উপত্যকার ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :

(ক) বাংলাভাষী ১৩ লক্ষ ৩২ হাজার ২০০ জন।

(খ) অসমীয় ভাষী ৬ হাজার ৮০০ জন।

(গ) অন্যান্য ভাষাভাষী অর্থাৎ হিন্দি, মণিপুরী ও ডিমাছা মিলিয়ে ছিল ৩ লক্ষ ৫ হাজারের মতো।

বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার উপর প্রথম আঘাত আসে স্বাধীন ভারতে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে। ২৪ অক্টোবর অসম বিধানসভায় বিল গৃহীত হয়। তাতে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে সর্বনিম্ন সংখ্যার ভাষা অসময়ীয় ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব আনা হয়। সেই বিল পাশ হয়ে গেলে বরাক উরপত্যকায় অন্যায় ভাবে অসমীয় ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ১৯৬১ সালের ১৯ মে বরাক উপত্যকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ১৫ মে থেকেই অসম পুলিশ ও সামরিক বাহিনী শিলচর শহরে মার্চ শুরু করে দেয়। ১৮ মে সন্ধ্যায় সত্যগ্রহীরা বিরাট মশাল মিছিল করে। আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং তা ঘোষণাও করে দেয়, বিশেষ করে রেল চলাচল অব্যাহত রাখতে কঠোর ব্যবস্থা করে। সত্যাগ্রহীরাও এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। পরিকল্পনা নেয় ১৮ মে রাত ১২ টার পর তারা রেল স্টেশন দখল করে নেবে।

কিন্তু তার আগেই অসম সরকার জানতে পেরে সিআরপি, পিএমসি, অসম পুলিশ ও অসম রাইফেলস-এ র জওয়ান স্টেশনের চতুর্দিক কর্ডন করে নেয়। সরকারি বাহিনীকে বেকায়দায় ফেলার জন্য মহিলা সত্যাগ্রহীরা অভিনব পন্থায় অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে অতর্কিতে সরকারি বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত সরকারি বাহিনী সরে পড়ে এবং তারপরই সত্যাগ্রহীরা হাজারে হাজারে স্টেশন চত্বরে ঢুকে পড়ে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। হাজার হাজার সত্যাগ্রহী সমস্ত সরকারি দপ্তর দখল করে নেয়। বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে হাজার হাজার মহিলা ও পুরুষ। সত্যাগ্রহীরা নিরস্ত্র থাকা সত্ত্বেও পুলিশ বাহিনী কাঁদানে গ্যাস-শেল নিক্ষেপ করে তাদের উপর। সত্যাগ্রহীদের কেউ কেউ পুলিশের থেকে শেল ছিনিয়ে নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালায় এদিকে প্রায় দু' হাজার সত্যাগ্রহীকে সকাল ১১টার মধ্যে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেয় অসম পুলিশ বাহিনী। আন্দোলনকারী অনেককে পুলিশ ট্রাকে তুলে তাদের অনেক দূরে ফেলে দিয়ে আসে। সত্যাগ্রহীরা সেইস্থান সঙ্গে সঙ্গে পুরণ করে দেয় তাদের নিজস্ব ট্রাকে করে তুলে নিয়ে গিয়ে। বিকাল ৪টে পর্যন্ত সত্যাগ্রহের সময়সীমা ছিল। দুপুর দুটো পর্যন্ত সত্যাগ্রহীদের সতর্কতার কারণে বড়ো অঘটন কিছু ঘটাতে পারেনি। সত্যাগ্রহী ভর্তি একটি ট্রাক তারাপুর স্টেশনের কাছে আটকে যায়। কোনো কারণে এগোতে পারছিল না। হঠাৎ করেই ট্রাকটিতে আগুন ধরে যায়। বিএসএফ জওয়ানরা ঘটনা না বুঝেই নিরস্ত্র অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করতে শুরু করে। তবুও সত্যাগ্রহীরা রেললাইন ছেড়ে না পালিয়ে ভাষার মর্যাদা রক্ষায় গুলির মুখে অটল থাকে। রাইফেলের গর্জন থামলে পরে দেখা গেল ৯টি তরতাজা লাশ স্টেশন চত্বরে পড়ে আছে। পরদিন আরও দুটি লাশ পাওয়া

কমলা ভট্টাচার্য

কানাইলাল নিয়োগী

সুনীল সরকার

সুকোমল পুরকায়স্থ

হিতেশ বিশ্বাস

তরণী দেবনাথ

শচীন্দ্র পাল

চণ্ডীচরণ সুত্রধর

কুমুদরঞ্জন দাস

সত্যেন্দ্র দেব

বীরেন্দ্র সুত্রধর

যায়। এর মধ্যে একটি লাশ যোলো বছরের তরুণী ছাত্রী— কমলা ভট্টাচার্য। বাকি শহিদরা উনিশ বছরের শচীন্দ্র, সাঁইত্রিশ বছরের কানাইলাল নিয়োগী, কুমুদ দাস, একুশ বছরের তরুণী দেবনাথ, হিতেশ বিশ্বাস, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, সুনীল সরকার, সুকোমল পুরকায়স্থ, বীরেন্দ্র সূত্রধর ও সত্যেন্দ্র কুমার দেব।

১৯ মে গুলিবর্ষণ এবং ১১টি তরুণ প্রাণের আত্মাহুতির পর আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সত্যাগ্রহের ধরন পালটে অন্যরকম কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ঠিক করেন পরেরদিন সমস্ত সরকারি অফিস খোলার সঙ্গে সঙ্গে তারা অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়ে সমস্ত চেয়ার দখলে নিয়ে নেবেন। অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বসার জায়গা না পেয়ে ফিরে যেতেন, এমনই ভাবে সমস্ত প্রশাসন একমাস ব্যাপী অচল হয়ে পড়েছিল। ২০ মে সমস্ত লাশ কাঁধে বহন করে বিরাট শোকমিছিল সারা শিলচর শহর প্রদক্ষিণ করে। ২৯ মে বরাক উপত্যাকার সর্বত্র এগারো জন শহিদ বীরদের স্মরণে শোকমিছিল পালন করা হয় এবং সর্বত্র ঘরে ঘরে অরন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। বেলা ২টা পর্যন্ত সমস্ত সরকারি দপ্তরে পিকেটিং চলে। বেলা ঠিক ২-৩৫ মিনিটে শহরে, গ্রামেগঞ্জে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদ স্বরূপ নীরবতা পালন করেন। গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে লোকসভা, বিধানসভার সদস্যবৃন্দ মহাকুমা পরিষদ, পঞ্চায়েত ও অন্যান্য স্বায়ত্তশাসনের সদস্যরা পদত্যাগ করেন।

অবশেষে সত্যাগ্রহীদের আন্দোলনের গভীরতা ও ব্যাপকতা লক্ষ্য করে সরকার পক্ষ আপোশের উদ্যোগ নেয়। সত্যাগ্রহী আন্দোলনের শীর্ষনেতাদের সঙ্গে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী দিল্লিতে বৈঠকে বসেন এবং বরাক উপত্যকার ভাষা সমস্যার সমাধান কল্পে আলোচনার প্রস্তাব দেন। সত্যাগ্রহীরা দাবি করেন সর্বপ্রথম সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সকল রাজবন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে এবং সেইমত ১৬ জুন বন্দিমুক্তির দিন ধার্য হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী আলোচনার জন্য শিলচরে আসেন এবং আলোচনার ফলশ্রুতিতে উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয় এবং অসম সরকার বাংলা ভাষাকে বরাক উপত্যকায় সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পরে সন্ধি অনুযায়ী ১৯৬০ সালে ভাষা আইন সংশোধন করে বরাক উপত্যকায় বাংল ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সাফল্য পায়। ১৯৭২ সালে শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার দাবি জানাতে গিয়ে বাচ্চু চক্রবর্তী নামে আরও একজন আত্মবলিদান করেন।

আবার ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে তৎকালীন অসমের মুখ্যমন্ত্রী বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জ সফরে এসে নতুন ভাবে বরাক উপত্যকার সমস্ত স্কুলে অসমীয় ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ জারি করেন। প্রতিবাদে পুনরায় বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে যায় করিমগঞ্জে। অসম পুলিশ ওই বিক্ষোভ মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করলে জগন্ময় দেব ও দিব্যেন্দু দাস নামে দুই যুবকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। ফলে বরাক উপত্যাকার বাংলা ভাষা আন্দোলনে মোট শহিদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪ জন।

সেই থেকে আজও বাংলাদেশ-সহ ভারতের অসম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে ১৯ মে তারিখটি ভাষা শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়। □

# বিপন্ন হিন্দু

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ হিন্দু। প্রশ্ন উঠতেই পারে তবে হিন্দুরা বিপন্ন কেন? আজকের প্রতিবেদন সেটাই নিয়ে। আমরা যারা বিশেষ করে বাঙ্গালি হিন্দু আমাদের কেউ কেউ বলেন আমরা রামকে মানব কেন? আমাদের তো প্রধান উৎসব দুর্গাপূজা। খেয়াল রাখবেন যারা দুর্গাপূজাকে উৎসব বলেন, দুর্গাপূজা বলতে তাদের বাঁধে। তারা যুক্তি স্থাপন করে বলেন, 'উৎসবে' দোষ কোথায়? এই তো আমি দুর্গা উৎসবকে কী সুন্দর 'কার্নিভাল' বানিয়ে দিলাম। কোথায় আমায় ধন্য ধন্য করবে, তা নয়। কেবল সমালোচনা। দেখুন সেই তিনি রেড রোডে ইদের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'পবিত্র ইদ'। সমগ্র মুসলমান সমাজ যা বলেন তিনিও তাই বলেন। অবশ্যই আমরাও তাই বলি।

প্রশ্ন হলো, যারা ভক্তি ভরে দুর্গা পূজা করেন, তাদের শুচি-শুদ্ধ অনুষ্ঠানকে 'উৎসব' আখ্যা দেওয়া কেন? দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে আমাদেরই কেউ কেউ ছোটো বড়ো কথা বলে পার পেয়ে গেছে। আমরাই মাছের আঁশের বা বিড়ির টুকরো দিয়ে মা সরস্বতীর মূর্তি তৈরি করে পূজা করেছি। আমরাই তা দল বেঁধে দেখতে গেছি। কেউ প্রশ্ন করলেই আমরা প্রতিবাদ করে নিজেদের উদার, প্রগতিশীল বা আধুনিক প্রতিপন্ন করেছি। আমরা নিজেরাই আমাদের ধর্মবোধে আঘাত করেছি। নিজেরাই নিজেদের বুদ্ধির তারিফ করেছি। আমাদের এই কার্যকলাপের ফলেই মুকবুল ফিদা হুসেন নগ্ন সরস্বতী অঙ্কন করে তা প্রদর্শনী করার সাহস দেখাতে পেরেছেন। তখনও আমাদের অনেকেই শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে জোরদার আওয়াজ তুলেছিল। অপরের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে তা কত জন বুঝেছিল? দেখুন আজ তারাই কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসে আঘাতের কথা বলছেন। কেন এই দ্বিচারিতা? এদের আপনি কী বলবেন? বুদ্ধিমান, আধুনিক, নাকি উদার? আসলে এরা মূর্খ। ইংরেজিতে বলে স্টুপিড।

এরাই বলে রাম আমাদের নয়। আমাদের কাছে দুগোৎসব বড়ো। আমরা নিজেরাই এতই প্রগতিশীল যে আমরা এখন শারদোৎসব বলি। এই উৎসব উৎসব করতে করতেই আমরা মায়ের মাহাত্ম্য ভুলে গেছি। মা দুর্গা আসেন তার দুই পুত্র ও দুই কন্যাকে নিয়ে। তারা হলেন— লক্ষ্মী-গণেশ, সরস্বতী ও কার্তিক। আমরা জানি আমাদের চার বর্ণ আছে। তা হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে। গোল বেঁধেছে ব্রাহ্মণকে বর্ণশ্রেষ্ঠ বলায়। শূদ্রকে তিন বর্ণের দাস বলে ছোটো করায়।

আমরা একবার মা দুর্গার চার সন্তানের কথা ভাবব। এখানে সরস্বতী ব্রাহ্মণের প্রতীক। কার্তিক ক্ষত্রিয়ের, লক্ষ্মী বৈশ্যের ও গণেশ হলো শূদ্রের প্রতীক। এখানে কেউ ছোটো বা বা কেউ বড়ো নয়। গণেশের পূজা হয় সবার আগে। মা দুর্গা হলেন ভারতপ্রতিমা। আমরা উৎসবে মত্ত থেকে ভারতাত্মার ডাক শুনতে পাইনি। আমরাই উৎসবে মেতে থেকে না বুঝেই মূর্খামি করেই কি হিন্দু সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করিনি?

আমরা উদারতার ঢাক পিটিয়ে আধুনিক ও প্রগতিশীল হয়েছি। আমাদের ছেলে-মেয়েরা ভিন ধর্মের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা করলেই আমাদের ভিতরের ঘুমন্ত হিন্দুত্ব জেগে ওঠে। তখন আমরা ছটফট করি। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রয়াত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় উজ্জ্বল উদাহরণ।

৭০ শতাংশ হিন্দু আজ বিভিন্ন জাতপাতে বিভক্ত। এটাই আমাদের বিপন্ন করেছে। অতীতের ভুল আজ সংশোধন করার দিন এসেছে। আমরা স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন করছি। জাতপাত নিয়ে আমরা উদাসীন— চতুর নেতৃত্ব দেখলাম। যারা শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত, তাদের জোর করে পিছিয়ে পড়া সমাজের নেতা করে দেওয়ায় তারা স্বাভাবিক কারণেই উদাসীন থেকেছেন। তাদের দিয়ে কাজ হয়নি সমাজের। তাই এতোদিন পরেও সমাজ অন্ধকারে পড়ে আছে। আর এক ধরনের চতুর নেতা, যারা সমাজের কাজ কম করে নিজের কাজ বেশি করেছেন। সামান্য খোলার ঘর থেকে বৃহৎ অট্টালিকায় প্রবেশ করেছেন। নিজে যত বৈভবশালী হয়েছেন সমাজকে ততটাই পিছনে ফেলেছেন। কী লাভ হবে এদের দিয়ে। আজ এই পিছিয়ে পড়া মানুষদের আলোয় আনতে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তবেই হিন্দুত্ব বোধের প্রকাশ ঘটবে। হিন্দু আর বিপন্ন বোধ করবে না। সিংহের মতো গর্জন করে রাজার আসনে বসবে।

**—শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি, হাওড়া-৯।

# বিপ্লবী বীর সাভারকার হিন্দু জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী ছিলেন

পরাধীন ভারতবর্ষের যেসব প্রাতঃস্মরণীয় দেশভক্তরা দেশ, সমাজ গঠনে নিজেদের তিলে তিলে নিঃশেষ করেছেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে অমানুষিক যাতনা সহ্য করেছেন, অথচ স্বাধীন ভারতে প্রাপ্য সম্মান তো দূর অস্ত, কপালে শুধু বঞ্চনা, নিন্দা আর শাস্তিই জুটেছে, বীর সাভারকার তাদের মধ্যে অন্যতম। অত্যন্ত মেধাবী সাভারকার একাধারে ছিলেন বহু ভাষাবিদ লেখক, আইনজীবী, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, অপরদিকে ছিলেন কুশলী সংগঠক, দুর্ধর্ষ বিপ্লবী, যার অন্তরে ছিল তীব্র দেশপ্রেম। ইংরেজদের রক্তচক্ষু উপক্ষো করে ছাত্রাবস্থাতেই দেশে স্থাপন করেছিলেন 'মিত্রমেলা', 'অভিনব ভারত' নামক ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠন। এমনকী আইন পড়তে গিয়ে খোদ লন্ডনে 'ইন্ডিয়া হাউসের' সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিপ্লবী সংগঠন 'ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটি', যার মাধ্যমে দেশে রিভলবার, জাতীয়তাবাদী পুস্তক পাঠানো

হতো। ১৮৫৭ সালের তথাকথিত মহাবিদ্রোহকে নিয়ে তার ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক 'The Indian War of Independence' বইটিতে গবেষণমূলক তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করেছিলেন যে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ আসলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রাম। বইটির এবং অন্যান্য বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কারণে লন্ডনে সাভারকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর যখন মোরিয়া নামক জাহাজে তাঁকে ভারতে পাঠানো হচ্ছিল, তখন ফ্রান্সের মার্সেইলে বন্দরের কাছে তিনি জাহাজের শৌচালয়ের জানালার লৌহ গরাদ ভেঙে ফেলেন তারপর ঝাঁপিয়ে পড়েন উত্তাল সমুদ্রে। আজকে যে সমুদ্রে সাঁতারুদের প্রাণ রক্ষার জন্য নানারকম সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয় সেই উত্তাল সমুদ্রে সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশে, অসুরক্ষিত অবস্থায় পদে পদে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে সাঁতরাতে থাকেন।

পাশাপাশি চলছিল ইংরেজ বাহিনীর মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ। যাইহোক এরপর বহু চেষ্টার পর রক্তাক্ত অবস্থায় বন্দরের প্রাচীর অতিক্রম করতে পারলেও ফ্রান্সের ভূমিতে বেআইনি ভাবে ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রবল পাহারায় হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে শৃঙ্খলিত অবস্থায় আন্দামানে আনা হয়। আন্দামান সেলুলার জেলে একাকী কনডেমড সেলে থাকলে অধিকাংশ বন্দিই হয় পাগল, নয় অসহায় মৃত্যুবরণ করতেন।

ব্রিটিশ শাসকদের প্রবল প্রতিস্পর্ধী হওয়ার জন্য সেখানে সাভারকারের খাতির-যত্ন একটু বেশিই হতো। তাকে প্রত্যেকদিন বলদের পরিবর্তে ঘানি টেনে ১৪ কেজি করে তেল বার করতে হতো। নারকেল ছাড়াতে হতো, পাথর ভাঙতে হতো। পাশাপাশি চলত অমানুষিক নির্যাতন। এত পরিশ্রম করবার পর খাদ্যের বদলে মিলত অখাদ্য। তাতেও অনেক সময় কীটপতঙ্গ মিশিয়ে দেওয়া হতো। সাভারকারকে সেই খাবার বেছে বেছে খেতে হতো। তবুও তিনি হার মানেননি দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে গেছেন। সাভারকারই বিশ্বের একমাত্র বিপ্লবী যিনি দু-দুবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। ইতালিয়ান বিপ্লবী ম্যাজিনির একনিষ্ঠ ভক্ত। সাভারকার সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন। কারাবন্দি অবস্থাতেও নিরক্ষর বন্দিদের স্বাক্ষর করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার প্রচেষ্টায় সেলুলার জেলে একটি লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের নামের আগে স্বাভাবিক ভাবেই 'বীর' শব্দটি যুক্ত হয়েছে।

তবে ভদ্রলোকটির অতীব একটি 'দোষ' ছিল— যা এই ভণ্ড সেকুলার দেশে ক্ষমাহীন অপরাধ হিসেবে দেখা হয়। তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। দার্শনিক এই ব্যক্তিটি অনুধাবন করেছিলেন যে, মুসলমান নেতারা মুসলমানদের জন্য ভারতবর্ষকে টুকরো করে ছাড়বে, (পরবর্তীকালে তা হয়েওছিল) কিন্তু সাংস্কৃতিক ভাবে প্রাচীন অধিবাসী হিন্দুরা এদেশ ছেড়ে যাবে কোথায়? তাই হিন্দু জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে, হিন্দুশক্তির পুনরুত্থানের মাধমে স্বাধীন অখণ্ড, শক্তিশালী ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই বিশেষ 'দোষটি' না থাকলে বীর সাভারকার বোধহয় এতদিনে ভারতরত্ন পেয়ে যেতেন। কৌশলগত কারণে তিনি কখনও কখনও হয়তো ইংরেজদের সঙ্গে শঠে শাঠ্যং করেছিলেন, কিন্তু এর জন্য এই মহান আত্মাকে কোনো ভাবেই কলুষিত করা যায় না।

**—মন্দার গোস্বামী,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

## সম্প্রতি সুপ্রিমকোর্টের আদেশে পতিতাবৃত্তি এখন পেশা

জীবন যেমন সত্য, ভালোবাসা যেমন সত্য, তেমনি জীবনে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও সত্য। যৌন সংসর্গ যদি টাকার বিনিময়ে হয়, সেটা হবে পতিতাবৃত্তি আর যদি না হয় ধরে নেব জীবনের অংশ। পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসা পতিতাবৃত্তি।

আমরা যদি বৌদ্ধ যুগে ফিরে যাই আমরা সকলে জানি আম্রপালির নাম যিনি একজন নগর গণিকা ছিলেন। পরবর্তীকালে ভগবান বুদ্ধদেবের সংস্পর্শে এসে তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' গল্পে'র বাবু তারা যারা পতিতালয়ে গমন করেন। বাঁচার অধিকার যদি মৌলিক অধিকার হয়, বাঁচার অন্যতম শর্ত যদি পতিতাবৃত্তি হয়, পতিতাবৃত্তিও মৌলিক অধিকার। যৌনকর্মীদের দীর্ঘ লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে সম্প্রতি সুপ্রিমকোর্টের আদেশে। এখন থেকে তারা আর পতিতা নয়, তারা এখন শ্রমজীবী। আদেশে বলা হয়েছে তারা সসম্মানে এই বৃত্তি নিজের ইচ্ছায় করতে পারেন। পুলিশ আর কোনো হয়রানি করতে পারবে না। কোনো ফৌজদারি কেসও দিতে পারবে না। তারা সহনাগরিকদের মতো সম্মান এবং সুরক্ষা পাবেন।

এমনকী তাদের ছেলে-মেয়েরাও তাদের সঙ্গে থাকতে পারে যেমন একজন অফিস কর্মীর ছেলে বা মেয়ে তার সঙ্গে থাকে। পশ্চিমি দেশের সেক্স ওয়ার্কাকাররা সেক্স এনজয় করার জন্য এই পেশায় যুক্ত হয়। তাদের এটা পেশা নয় নেশা। আর আমাদের এখানে যারা এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হয় শুধুমাত্র পেটের টানে। তাদের এটা নেশা নয়, পেশা। তাই তারা হয় পতিতা। এখন তাদের এই পেশার আইনি স্বীকৃতি মিলেছে। সাধুবাদ জানাই। এখন দেখার পালা সমাজ কী এখন তাদের সেই সম্মান দেবে? তাদের এই পেশা তো দুঃখের পেশা, পেটের টানের পেশা। কী পরিবর্তন হবে। তবে এই আদেশ বলে পুলিশি হয়রানি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে হয়তো।

**—সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

*With Best Compliments from -*

**A**
**Well Wisher**

# মায়েরা ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরির কারিগর

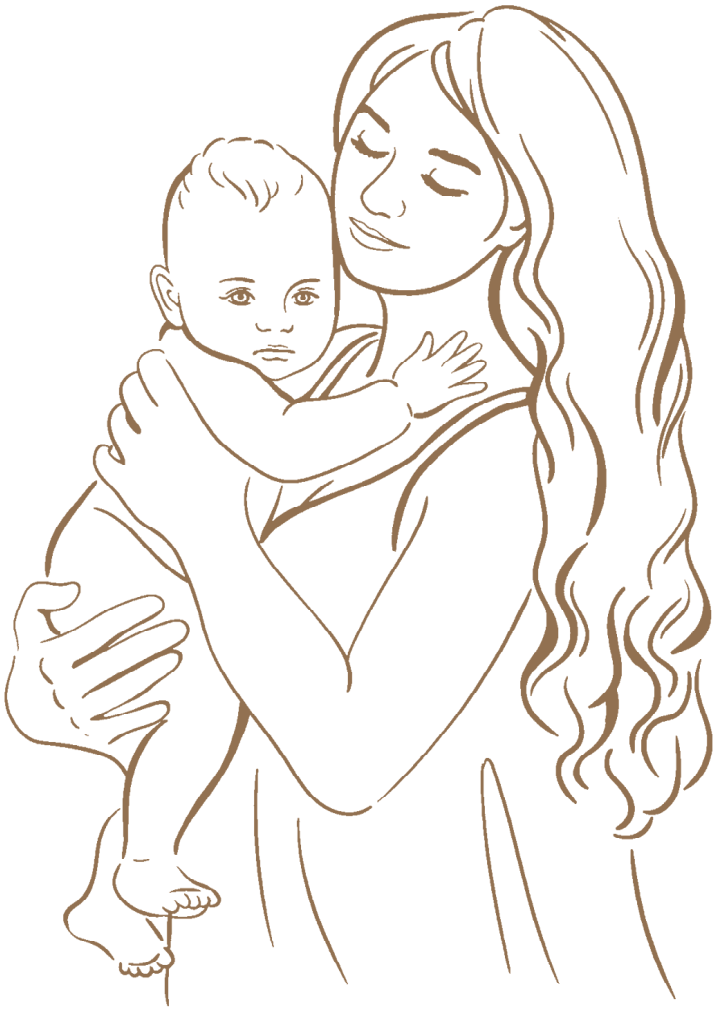

**সুতপা বসাক ভড়**

সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলির ফলও বেরিয়ে গেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বর্তমান প্রজন্ম তাদের পড়াশোনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি সচেতন। তারা বিভিন্নভাবে পড়াশোনায় দক্ষতা বাড়িয়ে চলেছে। খুবই ভালোভাবে উত্তীর্ণ হওয়া বিদ্যার্থীদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে জানা গেছে যে, বেশিরভাগ বিদ্যার্থী মোটামুটি একই রকমভাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। পদক্ষেপগুলো অনেকটা এইরকম— অভিভাকরা মূখ্যত অনেক অর্থব্যয় করে নামকরা ব্যবসায়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কোচিঙে তাঁদের সন্তানদের ভর্তি করিয়েছেন। এরপর তাঁরা তাঁদের জীবনের না পাওয়া উচ্চাশার বোঝা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্তানদের ওপর চাপিয়ে দেন।

বিদ্যার্থীরা অনেকটা যন্ত্রের মতো তাদের অভিভাবকদের ইচ্ছাপূর্তির জন্য পরিশ্রম করে চলে। বেসরকারি বিদ্যালয়, কোচিং সেন্টার সবই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যালয়গুলিকে বিশেষ পছন্দের তালিকায় রাখা হয় না। কিছু বিশেষ পদ্ধতিতে যেমন— ৮ ঘণ্টা ঘুম, ২ ঘণ্টা অন্যান্য দৈনন্দিন কাজ, বাকি ১৪ ঘণ্টা তারা নিজেদের ঘষে মেজে তৈরি করছে। এই সকল বিদ্যার্থী আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। মনে রাখতে হবে, সচেতন শিক্ষার্থীরা মোটামুটি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই নাক-মুখ গুঁজে এই ইঁদুর দৌড়ে নেমে পড়ে। অর্থাৎ বারো বছর থেকেকুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত তাঁরা শুধুমাত্র বইয়ে মুখ গুঁজে কাটিয়ে দেয় নিজেদের স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরির লক্ষ্যে। এরা সমাজের প্রথম সারির ছাত্র-ছাত্রী। এইভাবে কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যে পদার্পণ করে তারা। তাদের জীবনের লক্ষ্য উচ্চশিক্ষা, প্রভূত অর্থ উপার্জন। এখন প্রশ্ন হলো, ভবিষ্যৎ নাগরিকদের এই লক্ষ্য কী যথাযথ? তারা কি মা, বাবা, পরিবার, সমাজ, দেশকে চেনার চেষ্টা করছে? পরিবার, সমাজ, দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা আমরা তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারছি কি। তাদের 'মানুষ' করতে গিয়ে যন্ত্রমানব তৈরি করছি না তো? আগামী প্রজন্মকে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার সময় এসেছে।

আমরা সবসময় তাদের বিজয়ী হবার জন্য উৎসাহিত করি। খুব ভালো কথা। কিন্তু আমরা কি তাদের বলেছি যে, সফলতার জন্য তৈরি হওয়ার সময় ব্যর্থতার মুখোমুখি হওয়ার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে? এমন মানুষ দুর্লভ যে তার সম্পূর্ণ জীবনে কেবলমাত্র সফল হয়েছে। বলা হয় ব্যর্থতাই সফলতার সোপান। ব্যর্থতা থেকে পাওয়া শিক্ষা আমাদের এগিয়ে দেয় সাফল্যের পথে। আমরা আমাদের সন্তানদের বলেছি কি, জীবনের পথে সাফল্য আসে ব্যর্থতার হাত ধরে? পরাজয়টাও জীবনের চরম সত্য?

হেরে যাওয়া মানে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া নয়, বরং জীবনের পথে এর থেকে বড়ো শিক্ষা আছে কিনা সন্দেহ! সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতার জন্যও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। জীবন অনেক বড়ো ও বহুমুখী। একদিকে হেরে যাওয়া মানে সব পথ বন্ধ হয়ে গেল এমনটা নয়, বরং আরও নতুন নতুন পথ তৈরি হয়ে যায়।

কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের সার্বিক বিকাশের জন্য একজন দায়িত্বশীল ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে প্রস্তুত করার জন্য মায়েদের ভূমিকা অপরিসীম। মা ও সন্তানের বন্ধন হয় খুবই দৃঢ়। এই স্থানে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করব। □

# সস্তার লিপস্টিক মূত্রাশয়ের ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়

**ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক**

লিপস্টিকে নিজেকে সুন্দরী দেখালেও খাদ্যনালী ও মূত্রাশয়ের ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। লিপস্টিকের রং যত উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় হবে ততই মহিলাদের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে। যিনি নিজেকে সুন্দরী দেখানোর জন্য যত বেশি নিম্নমানের লিপস্টিক ব্যবহার করেন তাঁর তত বেশি পাকস্থলী ও মূত্রনালীর নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আবার পুরুষরাও সাবধান, সঙ্গিনীর কমদামি লিপস্টিক মাখা ঠোঁটে বেশি চুমু খেলে একই রোগে আক্রান্ত হওয়ার জোর আশঙ্কা থাকছে। লিপস্টিকই একমাত্র প্রসাধন যা সরাসরি মুখের ভিতর এবং শরীরে প্রবেশ করতে পারে অনায়াসে। লিপস্টিকের উপাদানে মিশে আছে প্যারাফিন ওয়াক্স, স্যাকারিন, পিভিসি প্লাস্টিক ও খনিজ তেল।

লিপস্টিকের নানা রং তৈরির জন্য প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলো টাইটানিয়াম অক্সাইড, ব্রোমাইড এবং ইথানল ও প্রোপানল যৌগ ব্যবহার করে। ঠোঁট রং করতে যত দামি ও নামি কোম্পানিই হোক না কেন, সবাই-ই কম-বেশি এমন সব ভয়াবহ রাসায়নিক জটিল যৌগ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়, বিশেষ করে স্থায়ী রং তৈরির ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি ক্রোমিয়াম, ব্রোমাইড ও সিসা ব্যবহার করে থাকে। চকচকে রং করার জন্য নিম্নমানের লিপস্টিক কোম্পানিগুলি আর্সেনিকও ব্যবহার করে থাকে। লিপজেল বা লিপগ্লস তৈরির ক্ষেত্রে পেট্রোপণ্যের উপজাত ব্যবহার করা হয়। বাজারে যতগুলো বেদনা উপশম মলম বা জেলি পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট। ম্যাসাচু সেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যা বিভাগের গবেষকরা প্রায় তিন বছর ধরে বিশ্বজুড়ে সমীক্ষা চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন, মহিলাদের পাকস্থলী, অন্ত্র ও মূত্রনালীর ক্যানসারের একটা বড়ো কারণ অতিরিক্ত প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহার। এক্ষেত্রে ওষ্ঠরঞ্জনী যে নারীর কাছে অনেক বেশি বিপজ্জনক তা স্পষ্ট হয়েছে নিউ ইয়র্ক স্টেট হাসপাতালের চিকিৎসকদের দুই দশকের গবেষণায়। লিপস্টিক জিভে লাগলে যে মিষ্টি লাগে, তার মূল কারণ রঙের সঙ্গে মিশে থাকা স্যাকারিন। কিন্তু স্যাকারিন ধারাবাহিকভাবে অন্ত্রে পৌঁছলে মূত্রাশয়ে ক্যানসার হতে পারে। ওষুধের ক্ষেত্রে কী কী উপাদানে তৈরি তা লেবেলে লেখা থাকে। কিন্তু প্রসাধন সামগ্রীর গায়ে তেমন কিছুই লেখা থাকে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, কসমেটিক তৈরিতে ইথানল ও প্রোপানল ছাড়াও পেট্রোলিয়ামজাত সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। এর ফলে ইউরিনারি ক্যানসার হয়ে থাকে। অ্যাসবেস্টস পাউডার ফুসফুস ও গ্যাস্ট্রো ক্যানসারের অন্যতম কারণ। লিপস্টিকের পাশাপাশি মেকআপ সমাগ্রীর একটা বড়ো অংশই পেট্রোপণ্যের উপাদান। মেকআপ সামগ্রীর মধ্যে ফরম্যালডিহাইড, অ্যালকোহল, কোল-ট্রেডস ও প্লাস্টিক রেজিন সামগ্রী দিয়ে তৈরি হয়। পাউডার সামগ্রীতে অ্যাসবেস্টস মেশানো থাকে হামেশাই। নিম্নমানের পাউডারে অ্যাসবেস্টস ব্যবহৃত হয়। নিঃশ্বাসের সঙ্গে অ্যাসবেস্টস গুঁড়ো ফুসফুসে ঢুকলে লাং ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মেকআপ তোলার জন্য বাজারে যে সমস্ত সস্তা তরল পদার্থ পাওয়া যায় তার অধিকাংশই ইথাইল অ্যালকোহল ও ফরম্যালডিহাইড দিয়ে তৈরি। এতে ত্বক যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাত্রাতিরিক্ত স্যাকারিন শরীরে প্রবেশ করলে গ্যাস্ট্রো এবং ফুসফুসে ক্যানসার হয়।

মূত্রনালীর ক্যানসারের জন্য দায়ী অতিরিক্ত মাত্রায় স্যাকারিন ব্যবহার। তবে প্রসাধনের ক্ষতিকারক বিষয় নিয়ে আরও গবেষণা হওয়া দরকার। লিপস্টিক টাইটানিয়াম অক্সাইড, ব্রোমাইড, স্যাকারিন এবং ইথানল ও প্রোপানলের মতো ভয়াবহ রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করা হয়। রং স্থায়ী করার জন্য এই ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করতে বাধ্য হয় অসাধু সংস্থাগুলি। ক্রোমিয়াম, ব্রোমাইড, এমনকী সিসাও ব্যবহার করা হয় লিপস্টিকে। কমদামি লিপস্টিক প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি রং চকচকে করার জন্য আর্সেনিকও ব্যবহার করে থাকে। □

# প্রতিবাদের নামে সারা দেশে তালিবানি সন্ত্রাস

**অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়**

বিজেপির প্রাক্তন মুখপাত্র নূপুর শর্মা একটি টিভি শোয়ে হজরত মহম্মদকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার পর সারা দেশে এখন আগুন জ্বলছে। পরিস্থিতি এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে শুক্রবার এলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন বেশিরভাগ মানুষ। উল্লেখ্য, ৩ জুন, ১০ জুন ও তারপর ১৭ জুন জুম্মার নমাজের পর তালিবানি সন্ত্রাসের চেহারা নিয়েছিল মুসলমান সমাজের কিছু দুষ্কৃতীর প্রতিবাদ। প্রশ্ন হলো, প্রতিবাদের নামে এই অসভ্যতার পিছনে কারা রয়েছে? কী তাদের উদ্দেশ্য? তারা কি ইসলামের সম্মান রক্ষার্থেই এসব করছেন না কি তাদের উদ্দেশ্য এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে এই ভাবে ভয় দেখাতে দেখাতে তাদের আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেওয়া?

**অভিযোগ**

একটি টিভি শোয়ে বিজেপির প্রাক্তন মুখপাত্র নূপুর শর্মা বারবার শিবলিঙ্গ নিয়ে কুকথায় উত্তেজিত হয়ে বলেন, হজরত মহম্মদ ন' বছর বয়েসি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি জানান একথা কো রানে এবং আল-বুখারি হাদিশে রয়েছে। নূপুর শর্মার এই মন্তব্যের পর পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া এবং তাদের রাজনৈতিক মুখ এসডিপিআই প্রতিবাদের প্ল্যান বানিয়ে ফেলে। এদের ইন্ধন জোগানোর জন্য আসাদুদ্দিন ওয়েসি তো ছিলেনই।

এই প্ল্যানের প্রথম সফল রূপায়ণ আমরা দেখি, ৩ জুন, শুক্রবারে। জুম্মার নমাজের পর একদল মুসলমান হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে থাকে। তাদের দাবি, নূপুর শর্মার ফাঁসি চাই। এ প্রসঙ্গে যাবার আগে জানা দরকার নূপুর শর্মা যা বলেছেন তা কি ভুল? ড. জাকির নায়েক ছাড়া এ প্রশ্নের উত্তর কেই-বা দিতে পারেন!

**ড. জাকির নায়েক**

২০১২ সালের একটি

# ফ্রান্সে কার্টুন ভারতে আগুন

শার্লি হেবেদো। নামটা মনে পড়ছে? ফ্রান্সের এই বিখ্যাত পত্রিকায় হজরত মহম্মদের একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ জিহাদিদের বিধ্বংসী আগ্রাসন থেকে সে সময় রেহাই পায়নি ভারতও। বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদের নামে হিন্দু সম্পত্তি ভাঙচুর তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল খুনের ফতোয়া। উর্দু ভাষায় প্রকাশিত 'আওধনামা' পত্রিকা বিক্রি করার জন্য কয়েকজন হকারকে গ্রেপ্তার করে মুম্বই পুলিশ।

*ফ্রান্সের কুকর্মের প্রতিবাদে তামিলনাড়ুতে ভাঙচুর।*

কারণ পত্রিকার ওই সংখ্যায় শার্লি হেবেদো পত্রিকায় প্রকাশিত হজরত মহম্মদের কার্টুনটি ছাপা হয়েছিল। আওধনামা পত্রিকার সম্পাদক শিরিন দলভির নামে ফতোয়া জারি করে মোল্লাবাদীরা। বিতর্কিত কার্টুন ছাপার অপরাধে তামিল ভাষায় প্রকাশিত 'দীনামালা' পত্রিকার সম্পাদকের নামেও ফতোয়া জারি করা হয়। আগের দিনই প্যারিসে শার্লি হেবেদোর অফিস তছনছ করেছে জেহাদি দুষ্কৃতীরা। তামিল সম্পাদককে লেখা ফতোয়ার চিঠিতে তারা লিখেছিল, 'গতকাল শার্লি আগামীকাল দীনামালার।' কাশ্মীরে পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে প্রতিবাদীরা। হায়দরাবাদে ভবানীনগর থানায় জি নিউজের সুধীর চৌধুরীর নামে থানায় এফআইআর করেন মহম্মদ ইরফান নামের জামিয়া নিজামিয়া কলেজের ইসলামিক স্টাডিজের এক ছাত্র। এখন প্রশ্ন হলো, ফ্রান্সের কোনও ঘটনার রিপোর্টিং ভারতের কোনও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে তার জন্য কেন সম্পাদককে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হবে? ভারত কি ক্রমশ জেহাদি মুসলমানদের বর্বরতার মুক্তমঞ্চ হয়ে উঠছে? ■

ইউ-টিউব ভিডিয়ো আমাদের চোখে পড়েছে। চ্যানেলের নাম মুসলিম প্রিচার্স। সেই ভিডিয়োতে ড. জাকির নায়েক এক মুসলমান মহিলার প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন, হজরত মহম্মদ ন' বছর বয়েসি একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর নাম আয়েশা। যখন তাঁর ছ' বছর বয়েস তখন বিয়ের চুক্তি হয় আর আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয় তার তিন বছর পর। ড. জাকির নায়েক স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই ঘটনা কোরানে স্বীকৃত এবং আল-বুখারি হাদিশেও এর যথার্থতা মেনে নেওয়া হয়েছে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে নূপুর শর্মা ভুল কী বলেছেন? না, তাঁর মন্তব্যে তথ্যগত কোনও ভুল নেই। অন্তত ইসলামিক স্কলার হিসেবে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ড. জাকির নায়েকের খ্যাতির কথা বিবেচনা করলে বলতে হয়, নূপুর শর্মার তথ্য কোরানসম্মত। কিন্তু শাসক দলের জাতীয় মুখপাত্র হয়ে এরকম একটি মন্তব্য করা তাঁর উচিত হয়নি। এটা নীতিগত ভ্রম যা কার্যত দেশবিদেশের অ্যান্টি মোদী গ্যাঙের পালে হাওয়া জুগিয়ে চলেছে। নূপুর শর্মা বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র হবার কারণেই যে এটা হচ্ছে তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

**প্রতিক্রিয়া**

**৩ জুন, ২০২২, কানপুর**

নূপুর শর্মার টিভি শোয়ের এটিই ছিল প্রথম প্রতিক্রিয়া। এদিন জুম্মার নমাজের পর কয়েক হাজার মুসলমান নয়ি সড়ক ও এতিমখানা অঞ্চলে মিছিল বের করে। তাদের দাবি, বাজারের সব হিন্দু দোকানদারকে অবিলম্বে দোকান বন্ধ করতে হবে। হিন্দুরা রাজি না হওয়ায় শুরু হয় বোমাবাজি ও পাথরছোড়া। কয়েকটি দোকানে লুটপাট চালানো হয় বলে অভিযোগ। কানপুর পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে যায়নি। ১৮ জন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

**১৭ জুন, ২০২২**

মাঝখানে ১০ জুন ছিল শুক্রবার। এদিন নমাজের পর হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদের সামনে জড়ো হয় মুসলমানেরা। তারপর শুরু হয় মিছিল। দাবি, নূপুর শর্মাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। ধীরে ধীরে কালাপাথর, মেহেদিপাটনম, চন্দ্রায়ণগুট্টা, শাহিননগর ও সাইদাবাদেও ছড়িয়ে পড়ে মুসলমানদের বিক্ষোভ। এদিন বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিল যুবকেরা। তাদের প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল ইয়ুথ অব হুসেনিয়ালাম। ১০ জুনের বিক্ষোভ উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ ও সাহারানপুরেও দেখা গেছে। এই বিক্ষোভে পাথর ছোড়াছুড়ি হলেও ততটা মারাত্মকভাবে হয়নি যতটা হয়েছে এর সাতদিন পর, ১৭ জুন, ২০১২।

১৭ জুন, ২০২২, ভারতের চোদ্দটি রাজ্যে একসঙ্গে আছড়ে পড়ে বিক্ষোভ। এর ভয়াবহতায় কেঁপে ওঠে সারা দেশ। কাশ্মীর থেকে কর্ণাটক, গুজরাট থেকে অসম— সর্বত্র হিংসায় উন্মত্ত এক শ্রেণীর মুসলমানদের দেখতে পাওয়া গেছে। তারা হিন্দু মহল্লায় ঢুকে একের পর এক বাড়ি, দোকানঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করেছেন। বাড়ির ছাদ থেকে পাথর ছুড়েছেন। সব থেকে বড়ো কথা, সামনে রাখা হয়েছিল মহিলা ও শিশুদের। মুসলমান বিক্ষোভকারীরা যদি হজরত মহম্মদের 'অপমানে' আবেগতাড়িত হয়েই রাস্তায় নেমে থাকেন তাহলে উগ্রপন্থীদের এই কৌশল শিখলেন কী করে? কে শেখাল ওদের? হাওড়ার শলপে বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দেয়, বিজেপি মুর্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী মুর্দাবাদ। বিক্ষোভ তাহলে কীসের জন্য? ইসলামকে

ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এ সেই অ্যান্টি মোদী গ্যাঙের পুরনো গল্প নয় তো?

**পিএফআই এবং এসডিপিআই**

পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার নাম অনেকেই জানেন। এদের রাজনৈতিক সংগঠনের নাম সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব ইন্ডিয়া। নূপুর শর্মার মন্তব্যকে ঘিরে মুসলমানদের হিংসাত্মক প্রতিবাদের মাস্টারমাইন্ড বলে এদেরই মনে করা হচ্ছে। কারাউলি, খারগোনে জাহাঙ্গীরপুরী, কানপুর— সর্বত্র মানুষকে উস্কানি দেবার কাজটি এরাই করেছে। প্রত্যেক জায়গায় পিএফআই নেতাদের মারাত্মক উত্তেজক বক্তৃতার ভিডিয়ো ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে। এই নিয়ে জি নিউজের সুধীর চৌধুরী বিস্তারিত প্রতিবেদনও পেশ করেছেন। তাতে দেখা গেছে নূপুর শর্মার মন্তব্যের জন্য সরাসরি বিজেপি ও নরেন্দ্র মোদীকে দায়ী করা হয়েছে। এই বিক্ষোভ যে এক দীর্ঘ জিহাদের অঙ্গ তা বারে বারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন নেতারা। অর্থাৎ এই ধরনের উপদ্রব মাঝেমাঝেই হতে থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পিএফআইকে ফান্ডিং করে চীন। সুতরাং এই বিক্ষোভ যে একটি ভূ-রাজনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গ তা বোঝাই যাচ্ছে। বিশেষ করে নূপুর শর্মাকে সাসপেন্ড করার পরেও যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি ভারতের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল তাতে পরিকল্পনার গভীরতা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। ■

# কমলেশ তেওয়ারী এবং কালিয়াচক

২০১৬ সালে হিন্দু মহাসভার কার্যকর্তা কমলেশ তেওয়ারীর একটি মন্তব্যে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ভারতের জেহাদি মুসলমানেরা। কমলেশ বলেছিলেন, 'হজরত মহম্মদ হোমোসেক্সুয়াল।' মন্তব্যটি দুর্ভাগ্যজনক সন্দেহ নেই। ভারতের সংবিধানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও দায়িত্বজ্ঞানহীন মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। কিন্তু একজনের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের একাংশ যে

কালিয়াচক থানায় পুলিশের গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, তাও কি কোনও সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য? পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার কালিয়াচকে প্রতিবাদের নামে ইদারা-ই- শারিয়া ও আঞ্জুমান অহলে সুন্নাতুল জামাতের আহ্বানে আড়াই লক্ষ জেহাদি মুসলমান সমবেত হয়েছিলেন। কালিয়াচক থানা ভাঙচুর করে সমস্ত নথিপত্র-সহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বিডিও অফিস-সহ অন্যান্য পাবলিক প্রপার্টি লণ্ডভণ্ড করে দেয় দুষ্কৃতীরা। ৩৪ নং জাতীয় সড়কে উত্তরবঙ্গ পরিবহণের বাস জ্বলছে, এ ছবি অনেকেই দেখেছেন। স্থানীয় শনিমন্দির ও দুর্গামন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। হিন্দুদের ২৫টি বাড়ি ও দোকানে আগুন লাগানো হয়। আর যাই হোক, এই তাণ্ডবকে কখনই প্রতিবাদ বলা যায় না। এর পিছনেও বড়ো কোনও চক্রান্ত। এই চক্রান্ত কি গজওয়া- ই-হিন্দের? ■

# হজরত মহম্মদের চুল নিয়ে তুলকালাম

সালটা ১৯৪৬। খবর পাওয়া গেল কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদে রক্ষিত হজরত মহম্মদের চুল চুরি হয়ে গেছে। রটে গেল, এ নিশ্চয়ই হিন্দুদের কাজ! এই ঘটনার সব থেকে খারাপ প্রভাব পড়ল বাংলাদেশে (তখন পূর্ব পাকিস্তান)। ইসলামিক বোর্ডের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য আবদুল হাই ওখানকার হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান তখন পূর্ব পাকিস্তানে। ইসলামাবাদে ফেরার পথে ঢাকা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, হজরতবালের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানের হিন্দুদের যদি কোনও ক্ষতি হয় তিনি দায়ী থাকবেন না। অর্থাৎ পরোক্ষে নির্দেশ দিলেন, হিন্দুদের মারো। হলোও তাই। পূর্ব পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর ঘরবাড়ি

সেই সময়ও প্রতিবাদের প্যাটার্ন একইরকম।

জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। দোকানপাট লুট হলো দিনের আলোয়। অসংখ্য মহিলা ধর্ষিতা হলেন। কত যে হিন্দু খুন হলো তার হিসেব নেই। যারা বেঁচে গেলেন তাদের মধ্যে অনেকে চলে এলেন ভারতে। পরে পাওয়া গেল সেই চুল। কিন্তু যাদের যা ক্ষতি হবার তা হয়েই গেল। ■

# কেন্দ্র সরকারকে ইসলাম বিরোধী প্রতিপন্ন করতে নূপুর শর্মাকে সফট্ টার্গেট করা হলো

**সত্যপ্রকাশ ন্যায়মূর্তি**

ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় মুখপাত্র নূপুর শর্মার একটি বিতর্কিত মন্তব্য সাড়া ফেলে দিয়েছে গোটা দেশে। যে মন্তব্যের রেশ ধরে ৮-৯ দিন পর ভারতের নানা জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন, হাইওয়ে অবরোধ, দোকান বাজারে আগুন লাগানো, লুটপাট, মারধর থেকে শুরু করে নানা ধরনের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি করা হয়েছে। নেতৃত্বে ছিল এদেশের এক বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত মুষ্টিমেয় দল। তাদের দাবি ইসলামের প্রবর্তকের সম্বন্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করেছেন নূপুর। অতএব 'নূপুর শর্মাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে', 'নূপুর শর্মার ফাঁসি চাই' ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, নূপুর শর্মা যে ইসলাম এবং তার প্রবর্তককে অপমান করেছেন এমন বার্তা খানিকটা পরিকল্পিত ভাবেই ভাইরাল করে দেওয়া হলো সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী-সহ বিভিন্ন উপসাগরীয় দেশগুলোতে। যার প্রতিক্রিয়ায় ওই সমস্ত দেশ ভারতের কড়া সমালোচনা করে ভারতকে ধর্মসহিষ্ণু হওয়ার জ্ঞান দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই সমস্ত দেশে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের ডেকে সতর্কও করা হয়েছে। টিভি ডিবেটে নূপুর শর্মা কী বলেছেন তা নিয়ে বিশদে যাচ্ছি না। সবাই জানেন। তবে এই সমস্ত ঘটনার পর বিজেপি নূপুর শর্মাকে সাসপেন্ড করেছে। দলীয়ভাবে দায়িত্বমুক্ত করা হয়েছে আরেক বিজেপি নেতা নবীন জিন্দলকেও। তিনিও একই ধরনের বিতর্কে জড়িয়েছিলেন। আর নূপুরের নামে এফআইআর হয়েছে দেশজুড়ে। এমনকী পশ্চিমবঙ্গেও।

*নূপুর শর্মা*

*নবীন জিন্দাল*

বিগত দিনে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক গতিপ্রকৃতি ঘাঁটলে দেখা যাবে, এই ধরনের ধর্মীয় বিতর্ক নতুন কিছু নয়। বহুত্ববাদের দেশ বলে বিশ্বমঞ্চে ভারতের বিশেষ পরিচিতি আছে চিরকাল। অর্থাৎ ভারত ধর্মীয় ব্যাপারে একপেশে নয়। পক্ষপাতিত্বও করে না। বসুধৈব কুটুম্বকম এদেশের পরম্পরার স্বাক্ষর। এদেশে নানা ধর্মের মানুষ থাকেন। সবার কাছেই তার নিজের ধর্ম শ্রেষ্ঠ। কাজেই একজন যখন অপরজনকে অবদমিত করার চেষ্টা করেন তখন খোটাখুটি লাগেই। অনেকটা রান্নাঘরে রাখা বাসনপত্রের মতোই। নূপুর শর্মার মতো বিতর্কিত মন্তব্য কী এদেশে এই প্রথম? একেবারেই না। অতীতেও ও ধর্মের মানুষ এ ধর্মের সমালোচনা করেছে। কুকথা আওড়েছে। কটুকাটব্যও করেছে। এই তো কিছুদিন আগে পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী শিবলিঙ্গ নিয়ে নোংরা কথা আওড়েছে। কিন্তু সেসব নিয়ে তেমন কোনো বাড়াবাড়ি হয়নি। কারণ সহাবস্থানে মানিয়ে চলাই বড়ো ধর্ম। এটাই ভারতের শাশ্বত পরম্পরা। ধর্ম সম্পর্কে ভারতের অবস্থান যদি বিশ্বের অন্য দেশগুলোর মতো একপেশে হতো তাহলে আজ ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। সেখানে কোনো ব্রিটিশ বা মুঘল শাসনের অধ্যায় থাকতো না।

তাসত্ত্বেও আজকের দিনে নূপুর শর্মার এমন একটা মন্তব্য নিয়ে এত হইচই কেন? বিষয়টার একটু গভীরে গিয়ে দেখলে সত্যটা নির্ধারণ করা যাবে। তার জন্য শার্লক হোমস বা ফেলুদা হওয়ারও প্রয়োজন নেই। একটু বুদ্ধি খাটালেই হবে।

কিছুদিন আগে একটি ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলের ডিবেটে আমন্ত্রিত ছিলেন নূপুর শর্মা। সেখানে এক মহন্ত মহারাজ ও কংগ্রেস নেতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন দুজন ইসলামি স্কলারও। ডিবেটের বিষয় ছিল, 'কাশী জ্ঞানবাপী মন্দির না মসজিদ।' আলোচনা চলাকালীন কংগ্রেস নেতা ও দুই ইসলামি প্রতিনিধি একনাগাড়ে হিন্দু দেব-দেবী নিয়ে অশালীন মন্তব্য ও কটুকাটব্য করে নূপুরকে আক্রমণ করেন। যা নিয়ে অপমান বোধ করছিলেন মহন্ত মহারাজ ও নূপুর শর্মা। মনে রাখতে হবে, ওই ডিবেটে নূপুর শর্মা শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হয়ে যাননি। তিনি ওই বিতর্ক অনুষ্ঠানে হিন্দু ধর্মের হয়ে প্রতিনিধিত্বও করছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই নূপুরের মন্তব্য সেখানে একটা ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল মাত্র। ইট মারলে পাটকেলের আঘাত সহ্য করা শিখতে হবে। লাইভ অনুষ্ঠানে হিন্দু দেব-দেবীকে নিয়ে করা অপমানের জবাবে নূপুরও কয়েকটা 'ঐতিহাসিক সত্য' তুলে ধরেছিলেন মাত্র। তাতেই ওই সম্প্রদায়ের গায়ে এত জ্বালা পোড়া শুরু হয়, যে তার ৮-৯ দিন পর শুক্রবারের বিশেষ দিনে দেশের বড়ো শহরগুলোতে বিক্ষোভ ও অবরোধের নামে দেশের সম্পত্তি ধ্বংস করতে তারা নেমে পড়ে ময়দানে। নূপুর সেদিন কথাগুলো হাওয়ায় বলেননি। তার সাপেক্ষে প্রমাণও দিয়েছেন। তাদের ধর্মগ্রন্থের কত নম্বর আয়াতে কী লেখা আছে তা উদ্ধৃত করেছিলেন।

টিভি চ্যানেলের লাইভ অনুষ্ঠানে বসে নূপুর যে সত্যগুলো তুলে ধরলেন তা ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের একেবারে সাধারণ মানুষগুলোর

মধ্যে জানাজানি হয়ে গেলে ইসলামের অস্তিত্বই 'খতরে মে' পড়ে যাবে। অতএব নূপুর শর্মার মন্তব্যকে ইস্যু করে জেহাদে নেমে পড়তে হবে। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। ওই চ্যানেলেরই এক পরিচিত প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর জানালেন সেদিন ওই ডিবেটের মাঝখানে বিজ্ঞাপন চলাকালীন ইসলামি স্কলাররা আরও নোংরা ও ঘৃণ্য কথা বলেন। যা টেলিকাস্ট করা হয়নি। আসলে সবটাই ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পুরোটাই একটা চিত্রনাট্য। যা লেখা হয়েছে পরিকল্পিত ভাবে। পাঠকদের একটু মনে করিয়ে দিতে চাই অযোধ্যায় বিতর্কিত বাবরি ধাঁচার জায়গায় দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ শতক পর নিজের জন্মভূমিতে রামলালার পুনরাভিষেক হতে চলেছে। এই মহাপুণ্যলগ্ন সম্পন্ন হতে চলেছে মোদী সরকারের আমলে। মিথ্যার আড়াল সরিয়ে যে শাশ্বত ন্যায় প্রত্যক্ষ হতে পারে, আপামর জাতীয়তাবাদী ভারতীয় তা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। মোগলরা অন্যায় ভাবে ভারতের সারস্বত শিক্ষা, সনাতন সংস্কৃতি, বিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান স্বরূপ যে মন্দিরগুলোকে একের পর এক ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেছিল, সেইসব বিতর্কিত মসজিদে ক্রমশই মন্দিরের প্রতীকগুলো স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। আজকের স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে মোগলদের কুকীর্তিগুলো দ্রুত ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে কাশী থেকে কন্যাকুমারীতে।

সম্প্রতি জ্ঞানবাপী মসজিদের ওজুখানায় উদ্ধার হওয়া শিবলিঙ্গটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। জ্ঞানবাপী মন্দির না মসজিদ তা বুঝতে আর কারও বাকি নেই। এর পর মথুরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত কেশব মন্দির ধ্বংস করে আওরঙ্গজেব শাহি ইদগাহ তৈরি করেছিল। তার প্রমাণ শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। বাপ-ঠাকুরদাদের কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রমাদ গুনছে মুঘল বংশজরা। যে কারণে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে জ্ঞানবাপী মসজিদের ওজুখানা সিল করার পর পরই চলতি বছরের ২৯ মে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে দুদিনের সমাবেশ অনুষ্ঠান করে জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ। এই সমাবেশে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল মৌলানা মেহমুদ

মাদানির বক্তৃতা। তিনি কড়াভাষায় বর্তমান ভারত সরকারের সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'এটা আমাদের দেশ। আমরা এখানেই থাকবো। আমাদের রকমসকম যাদের পছন্দ নয়, তারা অন্যত্র চলে যাক। কারণ আজকের দিনে আমরাই মেজরিটি।' শুধু তাই নয়, ভারত সরকারের ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিলের বিরোধিতা করে তিনি বলেছেন, 'আমরা আমাদের শরিয়ত আইন ছাড়া অন্য কোনো আইন মানবো না। আমাদের ভাইয়েরা তালাক দিতে চাইলে দেবেন। তালাকের বিরোধিতা আমরা করতে দেব না।'

ব্যাপারটা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। বিগত দিনে কংগ্রেস ও বিভিন্ন জোট সরকারের আমলে যারা মর্জিমতো এদেশে দাপিয়ে বেড়িয়েছে, আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে ভারতকে শাসনের 'নেই রাজ্য' করে তুলেছিল, মোদী সরকারের আমলে তাদের আজ হাঁসফাঁস অবস্থা। শুধু তাই নয়, যেভাবে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার ৩৭০ ও ৫০ এ ধারা বিলোপ করে কাশ্মীরকে সন্ত্রাসবাদ মুক্ত করেছে এবং পাকিস্তানের টুঁটি চেপে ধরেছে তাতে ক্রমশ কোণঠাসা মাদানিরা। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতেই কি নূপুর শর্মাকে সফট্ টার্গেট করা হলো? যাতে করে বর্তমান বিজেপি সরকারকে বিশ্বমঞ্চে ইসলাম বিরোধী প্রতিপন্ন করে সাম্প্রদায়িকতার পালে হাওয়া লাগানো যায়!

বর্তমানে ভিন্ন ধর্মের মানুষ ভারতে বসবাস করার সুবাদে ধর্ম বিশেষে নিজের নিজের ধর্মীয় আইন অনুসরণ করে। বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ভারতের নিজস্ব সংবিধান থাকা সত্ত্বেও তার গুরুত্ব অনেকখানি খর্ব হয়। এ যেন মগের মুলুক। যে দেশে থাকবো সেদেশের সংবিধান মানবো না। মহিলাদের যখন তখন ডিভোর্স দেব। বঞ্চিত করবো। আর বলব আমাদের ধর্মীয় শরিয়তি আইনে এই বিধান আছে। এই কারণেই এদেশের বিশেষ সম্প্রদায়ের মহিলারা ভারতের গণতান্ত্রিক সুরক্ষা পাচ্ছেন না। ইউনিফর্ম সিভিল কোড অনুযায়ী ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষেত্রে একই আইন প্রযোজ্য হবে, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। চাপে পড়ে ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা জ্ঞানবাপী ইস্যুতে সুপ্রিমকোর্টের রায়ের সরাসরি বিরোধিতা তারা করতে পারছে না। তাই নূপুর শর্মাকে সামনে রেখে বিজেপিকে আক্রমণ করছে শাহারানপুরে মৌলানা মাদানির আক্রমণাত্মক বক্তৃতার দিনই একটি পৃথক সভায় এআইএমআইএম সংগঠনের পালের গোদা আসাদুদ্দিন ওয়েইসি বলেন, 'বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবার এদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছে।' ঘটনাগুলিকে পরপর সাজালে সহজেই বোঝা যায়, নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী যে প্রতিবাদ চলছে, তা পুরোটাই ওয়েইসি ও মাদানিদের পরিকল্পনা। ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের যাঁরা পথে নেমে ভাঙচুর চালাচ্ছেন, আমি হলপ করে বলতে পারি তাদের মধ্যে একজনও কোরান বা হাদিশ পড়েননি। যদি তারা পড়তেন তাহলে এভাবে গড্ডলিকা প্রবাহের মতো বিচার, বুদ্ধিতে তালা লাগিয়ে হাতে ফেস্টুন নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন না।

আসলে তাদের ওসব সত্য জানতে দেওয়া হয় না। পড়তে দেওয়া হয় না। মোল্লা-মৌলবির বলা কথাই সার। যারা ওই ধর্মের বিরুদ্ধে বলে, তাদের পালিয়ে বেড়াতে হয় তসলিমার মতো। আজকের দিনেও ওই সম্প্রদায়ের কোনও ভাইকে জিজ্ঞাসা করুন জোয়ার-ভাঁটা কেন হয়? তারা এমন একটা আলটপকা আজগুবি উত্তর দেবে যে প্রশ্নকর্তা পালিয়ে বাঁচবেন। এরা বিজ্ঞানও মানে না। সেটাও হারাম। গত ৬ জুন, রুবিনা খান নামে এক যুবতী তাঁর টুইটার 'হ্যান্ডল (@Rubinakhan 45) থেকে রাত ৯টা ৫১ মিনিটে একটি টুইট করে লিখেছেন, 'আমি কিছুদিন আগে হিন্দুদের কোরান আর হাদিশ পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম, বলেছিলাম আপনারা দেখুন ওখানে আপনাদের সম্বন্ধে কী লেখা আছে? তখন অনেক হিন্দু আমায় ভুল বুঝেছিল। নূপুর শর্মা আজ হাদিশের একটা উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন মাত্র, তাতেই পুরো ইসলামিক দুনিয়ায় গেল গেল রব উঠেছে। ইসলাম পন্থীরা যদি নিজেরা পুরো হাদিশ পড়েন তাহলে তারা বেশিরভাগই ইসলাম ত্যাগ করবেন।'

বিষয়টা হলো সচেতনতা, শিক্ষা ও সহবতের। এই মেয়েটি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সত্য খুঁজেছেন। এবং অকপটে স্বীকারও করেছেন। এভাবে আরও অনেকের চোখ খুলবে। একদিন সেইসব লোকেরাই নিজেদের ধর্মমত থেকে আজাদি চাইবে। সেদিন খুব বেশি দূর নয়। অতএব ওদের ফ্রাইডে প্রোটেস্ট বা জমায়েতে ভীত হওয়ায় কোনো করণ নেই। নূপুর শর্মার প্রতিও বীতশ্রদ্ধ হওয়ার কারণ দেখছি না। তবে কেউ যদি ভেবে থাকে এসব করে সিএএ, এনআরসি, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসনের মতো বিষয়গুলোকে প্রতিরোধ করা যাবে তো সে গুড়ে বালি। মসনদে বসে থাকা সর্বত্যাগী মানুষটার নাম নরেন্দ্র মোদী। যা বলেন, তা করে দেখান। এমনি এমনি তো আর প্রবাদটা তৈরি হয়নি— 'মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়।' □

# চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে মধ্যবঙ্গ লোকপ্রজ্ঞার অনুভব দর্শন অনুষ্ঠান

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক সংগঠন প্রজ্ঞাপ্রবাহের অন্তর্গত লোকপ্রজ্ঞা মধ্যবঙ্গের অনুভব দর্শন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় গত ৩ মে হুগলী জেলার চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে। অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাস্নানের মাধ্যমে। এরপর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যিক কালিকানন্দ অবধূতের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। গঙ্গাতীরে অবস্থিত বন্দেমাতরম্ ভবনও দর্শন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয় প্রণবকন্যা সঙ্ঘ আশ্রম পরিসরে। সংগঠন মন্ত্র উচ্চারণ করে ছোট্টো সংগীতশিল্পী ওম বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিকে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের পর হয় অতিথি বরণ ও পরিচয় পর্ব। স্বাগত বক্তব্য রাখেন লোকপ্রজ্ঞার রাজ্য সংযোজক ড. সোমশুভ্র গুপ্ত। স্বাধীনতার বীজমন্ত্র বন্দে মাতরম্ ও তার প্রভাব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ডাঃ আশিস কুমার মণ্ডল। লোকপ্রজ্ঞার উপদেষ্টা তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ বলরাম দাস রায় ঋষি পরশুরামের চরিত্র সকলের সামনে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বক্তব্য রাখেন আইআইটি খড়্গপুরের অধ্যাপক ও গবেষক ড. পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রণবকন্যা সঙ্ঘ আশ্রমের মাতাজী অমৃতানন্দময়ীজী, রিষড়া প্রেম মন্দিরের স্বামী শ্রীশ্রী নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী, ডুমুরদহ উত্তম আশ্রমের শ্রীশ্রী তিতিক্ষানন্দ মহারাজ। তাঁরা সকলেই অক্ষয় তৃতীয়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে আশীর্বচন প্রদান করেন। প্রজ্ঞাপ্রবাহের পূর্বক্ষেত্র সংযোজক অরবিন্দ দাশ সংগঠনের আগামী পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে ২২৫ জন প্রবুদ্ধ ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ বর্ধন ছিল আজকের অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এছাড়া কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন লোকপ্রজ্ঞা মধ্যবঙ্গের সংযোজক ড. দেবনাথ মল্লিক। কল্যাণ মন্ত্র পাঠ করে হরিপাল চর্চাকেন্দ্রের প্রথমশ্রেণীর ছাত্র তমোজিৎ দে। ছাত্র অনিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ রাষ্ট্রগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

## মালদহের শিবাজীনগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যালয়ের ভূমিপূজন

মালদহ জেলার শিবাজীনগরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নিজস্ব জমিতে কার্যালয় ভবন গড়ে তোলার জন্য গত ১৩ মে ভূমিপূজন অনুষ্ঠিত হয়।

এই শুভ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গাজোল প্রখণ্ড সভাপতি লক্ষ্মীরাম টুডু, সম্পাদক অনুপম গোস্বামী, সহ সভাপতি মানবেন্দ্র সরকার, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য নিখিল চন্দ্র মজুমদার। এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

# পুরীতে ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের অভ্যাস বর্গ

গত ১২-১৩ জুন ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা প্রান্তের কার্যকর্তাদের অভ্যাস বর্গ সম্পন্ন হয় পুরীর সরস্বতী শিশু মন্দিরে। বর্গে দুই প্রান্তের ৩৭ জন কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দীনেশ কুলকার্ণি এবং অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি কল্যাণ কুমার মণ্ডল। দুদিনের বর্গে সংগঠন, সংগঠনের বিস্তার এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা হয়। দীনেশ কুমার কুলকার্ণি জানান, কার্যকর্তাদের সাংগঠনিক পরিচয় এবং ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের সঙ্গে সব মানুষকে কীভাবে যুক্ত করা যায়— সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই অভ্যাস বর্গ। বর্গে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক শ্রীনিবাস। তিনি সংগঠনের বিভিন্ন বিন্দু নিয়ে চর্চা করেন। কল্যাণ কুমার মণ্ডল বলেন, 'কৃষকরাই যে ভারতের মূল শক্তি, করোনা মহামারীর সময়ে তা আরও একবার প্রামাণিত। কৃষকদের সার্বিক উন্নতির জন্য ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ বদ্ধপরিকর'।

# স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে বিদ্বৎ সম্মেলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারকে সংবর্ধনা

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে হুগলী জেলার ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরের বিদ্বৎ পরিষদের ব্যবস্থাপনায় গত ৮ জুন একটি বিদ্বৎ সম্মেলন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারবর্গকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সভাপতি ডাঃ বনমালী ভড় প্রদীপ প্রজ্বলন করে সম্মেলনের শুভারম্ভ করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য কৌশিক দুলে। তিনি অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপনে শিশুমন্দিরের বার্ষিক পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক, সমাজসেবী, বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী ও সুবক্তা ডাঃ স্বপন মুখার্জি। তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণার উৎসস্থল সম্পর্কে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন। অন্য অতিথি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিদ্যানগর কলেজের অধ্যাপক ভারতবর্ষের পুনর্নির্মাণ চেতনার অভিমুখে তীর্থযাত্রা

সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এরপর পার্শ্ববর্তী এলাকার স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারবর্গকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে অমৃত মহোৎসব স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। উপস্থিত প্রত্যেকটি পরিবারের প্রতিনিধি নিজ নিজ পিতা- পিতামহের সংগ্রামের ইতিহাসকে আবেগাপ্লুত ভাবে স্মৃতিচারণা করেন। তাঁরা শিশুমন্দিরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিশুমন্দিরের সম্পাদক ড. সমীর কুঁকড়ী। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

# বারো মাসে পঁচিশ রকম বেশে সজ্জিত হন শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেব

**উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল**

পিতামহ ব্রহ্মা তাঁর মায়ায় মোহিত হয়ে হাতজোড় করে স্তব করছেন— তুমি অদ্বিতীয়, তুমিই সত্য, আত্মা, পুরুষ, পুরাণ, অনাদি, অনন্ত, নিত্য, অদ্বয়, অক্ষর। তুমি স্বয়ং জ্যোতি, নিরুপাধি, নিরঞ্জন। তুমি ভূমানন্দ, অমৃত আনন্দস্বরূপ। (ভাগবত ১০/১৫/২৩)

শ্রীক্ষেত্রে এই অদ্বিতীয়, সত্য স্বরূপ পুরাণপুরুষ দারুব্রহ্ম জগন্নাথ রূপে নিত্য বিরাজিত। এখানে তিনি পুরুষোত্তম। মথুরায় কেশব, প্রয়াগে বিন্দুমাধব, কেরলে বাসুদেব, দাক্ষিণাত্যে পদ্মনাভস্বামী। মন্দারে মধুসূদন, নীলাচলে পুরুষোত্তম। আর এই পুরুষোত্তমের প্রতিদিনের পূজার্চনা, ভোগরাগের মতো বেশভূষা, পোশাক পরিচ্ছদও অত্যন্ত মনোরম, আড়ম্বরপূর্ণ।

বছরের বিভিন্ন মাসে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁর এবং অগ্রজ বলরাম ও ভগিনী সুভদ্রার পোশাক পরিচ্ছদের বিচিত্রতা ভারী দৃষ্টিনন্দন, ভক্তভাবুকের চিত্তহরণকারী। বছরের শুরুতে অর্থাৎ বৈশাখ মাসে প্রভুর চন্দনবেশ। অক্ষয় তৃতীয়া থেকে টানা ৪২ দিন ধরে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে চন্দনের স্নিগ্ধ প্রলেপ দেওয়া হয়। যাকে বলে চন্দন লাগি।

জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানপূর্ণিমার দিন স্নানমণ্ডপে মহাস্নানের পর শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলভদ্র গণেশবেশ ধারণ করেন। কথিত আছে, দক্ষিণদেশের কানিয়ারি গ্রামের গণপতি ভট্ট নামে এক গণেশের উপাসক শ্রীক্ষেত্রে স্নানযাত্রার দিন উপস্থিত হয়ে দারুব্রহ্মকে গণেশমূর্তিতে দেখতে না পেয়ে 'ব্রহ্ম নীলাচলে নাই'

নাগার্জুনা বেশ

বলে খেদ করেন। তখন বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান জগন্নাথ গণপতি ভট্টের বিশ্বাসের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে 'গণেশরূপে প্রকট হন। তারপর থেকে এই প্রথা চলে আসছে। সুভদ্রাদেবী এই দিন পদ্মবেশ ধারণ করেন। তাঁর শ্রীমুখমণ্ডলে পুষ্পের দ্বারা পদ্মের ন্যায় আকৃতি আরোপ করা হয়। এই মায়ের শুক্লা একাদশীতে শ্রীমদনমোহনের রুক্মিণীহরণ বেশ হয়। স্নানযাত্রার পরে অনবসরের শেষদিন আষাঢ়ের অমাবস্যায় প্রভুর নবযৌবনবেশ হয়ে থাকে।

বাহুড়া একাদশীতে অর্থাৎ রথ গুণ্ডিচা মন্দির থেকে শ্রীমন্দিরে ফিরে এলে শ্রীবিগ্রহগুলির সুনাবেশ অর্থাৎ স্বর্ণবেশ হয়। এটি রাজবেশ। প্রায় এক কুইন্ট্যাল ওজনের বিভিন্ন স্বর্ণালংকারে বিগ্রহগুলি সুসজ্জিত হন। স্বর্ণময় হস্ত, স্বর্ণময় পদ যুক্ত হয়। তাছাড়া স্বর্ণনির্মিত মুকুট, রাহুরেখা, শ্রীমালা, পদমমালা, সেবাতিমালা অগস্তিমালা কদম্বমালা, ময়ূরমালা, চম্পামালা, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি স্বর্ণাভরণে জগন্নাথদেব তখন 'অপরূপাভাতি, মোহনমূরতি, ভক্ত রঞ্জন।' শ্রাবণের অমাবস্যায় চিতালাগি বেশ। স্নানযাত্রার সময় শ্রীবিগ্রহগুলির ললাটের মণি খুলে রাখা হয়। শ্রাবণী অমাবস্যায় তা পুনরায় স্থাপন করা হয়। শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমীতে 'রাহুরেখালাগিবেশ।' স্নানযাত্রার সময় প্রভুর যে কর্ণপত্র খুলে রাখ হয়, এইদিন তা পুনরায় কর্ণে দেওয়া হয়।

ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর পর দশমী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বনভোজনবেশ, কালিয়দমন বেশ এবং বলরামের প্রলম্বাসুরবধ বেশ। প্রলম্ব নামক অসুরকে বধ করেছিলেন বলরাম, তাই সেই লীলাকে স্মরণ করে বলরামের এই প্রলম্বাসুরবধ বেশ। ত্রয়োদশীর দিন কৃষ্ণবলরাম বেশ। এরপর জগন্নাথ বামনবেশ ধারণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চম


চন্দন লাগি বেশ


শ্রাদ্ধ বেশ

গজানন বেশ

অবতার বামনদেব, সেই লীলা স্মরণে বামনরূপ গ্রহণ।

আশ্বিনের বিজয়া দশমীতে শ্রীজগন্নাথের রাজবেশ, স্বর্ণভূষণে সজ্জিত হয়ে জগন্নাথ রাবণবিজয়ী মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্ররূপে প্রকাশিত হন।

কার্তিক মাসে সবচেয়ে বেশি রূপে ধারণ করে প্রভু রত্নবেদিতে বিরাজ করেন। শ্রীরাধাদামোদর, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, পরশুরাম ও পূর্ণিমায় রাজাধিরাজ বেশে সাজেন। এসব ছাড়া কার্তিক মাসে আর একটি বিশেষ বেশ হলো— নাগার্জুনজয়ী বেশ। তবে এই বেশ অন্যান্য বেশের মতো প্রতিবছর হয় না। যে বছর কার্তিক মাসে পঞ্চমী তিথি ষষ্ঠীদিনে পালিত হয় সেই বছরই এই বেশ ধারণ করেন প্রভু। শ্রীকৃষ্ণের ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম যিনি নাগার্জুনকে বধ করেন। এই ঘটনাকে স্মরণ করায় নাগার্জুনজয়ী যোদ্ধা পরশুরামের রূপ। অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা ষষ্ঠী থেকে বিগ্রহগুলির শ্রীঅঙ্গে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়।

পদ্ম বেশ

পৌষ মাসে পূর্ণিমাতে পুষ্য অভিষেক হয়। অভিষেকের অন্যতম উপচার ১০৮ তাম্রঘটপূর্ণ গব্যঘৃত। অভিষেক শেষে বিগ্রহগুলি রাজবেশ ধারণ করেন।

মাঘ মাসে শ্রদ্ধা বেশ। কৃষ্ণা চতুর্দশী, অমাবস্যা ও শুক্লা প্রতিপদে এই শ্রদ্ধাবেশে সজ্জিত হন।

বসন্তপঞ্চমী তিথিতে বিগ্রহগুলির শ্রীঅঙ্গ থেকে শীতবস্ত্র উন্মোচন হয়। বসন্তপঞ্চমীর পূর্বে বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এই তিনদিনের মধ্যে যেদিন শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে নীল বা কালো রঙের উত্তরীয় দেওয়া হয় সেদিন রাত্রিকালে বড়ো শৃঙ্গারের সময় পদ্মবেশ হয়। অন্যান্য বেশ শয়নসময় থাকে না। কিন্তু এই বেশ শয়নের সময় বা সারারাত থাকে। অন্যান্য বেশ থেকে এটাই এই বেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

প্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্র

মাঘী পূর্ণিমার শ্রীবিগ্রহের গজ-উদ্ধারণ বেশ। ভাগবত মহাপুরাণ অনুসারে শ্রীবিষ্ণু একবার এক হাতিকে এক কুমিরের মুখ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। সেই লীলাকে স্মরণে রেখে এই গজ-উদ্ধারণ বেশ। শ্রদ্ধাবেশের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁদের দুই পিতা বসুদেব ও নন্দমহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই বিশেষ বেশ। এই উপলক্ষ্যে মহাপ্রভু জগন্নাথ ২৭ ফুট, বলরাম ২১ ফুট, দেবী সুভদ্রা ১৮ ফুট দৈর্ঘ্যযুক্ত বসন পরিধান করেন।

বসন্ত পঞ্চমীর দিন থেকে দোলযাত্রা আরম্ভ হয়। দোলপূর্ণিমায় আবার রাজবেশ। চৈত্র মাসে রামনবমীতে প্রভুকে শ্রীরামচন্দ্রের মতো সজ্জিত করা হয়। যাকে বলে রামরাজা বেশ।

এই ভাবে বছরের বারোমাস জগৎস্বামী জগন্নাথ অগ্রজ বলরাম ও ভগিনী সুভদ্রার সঙ্গে বিভিন্ন নয়নাভিরাম বেশ ধারণ করে ভক্তদের আনন্দ বর্ধন করেন। □

# দানিউব নদীতীর থেকে প্রিয় ভারতের মাটিতে

**কৌশিক রায়**

ভারতপ্রেমী এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের নিগড় থেকে ভারতের মুক্তিকামিনী, স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ্য শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার কর্মময় জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছিল শৈলশহর দার্জিলিঙে। তাঁরও অনেক আগে, প্রায় সকলের অজ্ঞাতেই ১৮৪২ সালে এই শৈলনগরীতেই মাত্র ৫৮ বছর বয়সে বিদায় নিয়েছিলেন ভারতহিতৈষী আর এক বিদেশি পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরির অন্তর্গত, দানিউব নদী তীরবর্তী বুদাপেস্ত নগরীতে জন্মানো এক কর্মবীর, ভাষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক। ভারতের মাটিতে পা রাখা নিকোলো কোন্তি, মার্কোপোলো, সিলভাঁ লেভি, ইব্‌নে বতুতা, তাভেরনিয়েন, স্যার টমাস রো, দোমিং গো পায়েজের মতো বিদেশি পর্যটকদের নাম হয়তো আমরা মনে রেখেছি। তবে, ওই 'মডেয়ার' বা হাঙ্গেরীয় ভারত পর্যটকের নামটি ভুলে যাওয়াটা আমাদের উচিত হয়নি। তিনি হলেন আলেক্সান্দর কোসোমা দে কোরোস। সম্প্রতি, নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য আর্টস-এর প্রদর্শনকক্ষে আলেক্সান্দর কোসোমা দে কোরোস-এর জীবন নিয়ে একটি বিশদ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো। এই প্রদর্শনী থেকেই উঠে আসে বিস্মৃতির অতলে প্রায় মুছে যাওয়া আলেক্সান্দর-এর ভারতময় জীবন নিয়ে বেশ কিছু তথ্য। ঊনবিংশ শতকে আবির্ভূত, হাঙ্গেরীয় সাহিত্যের পথিকৃৎ— মোর জোমই-এর উপন্যাস-'এপ্পুর সি মুয়োভে' এবং লাজোস আপ্রিলি, গিউলা ইউহাসাজ এবং সান্দোর এন্দ্রোদির লেখার মধ্যেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে

আলেক্সান্দর কোসোমাকে দেখা গেছে। ভাষাবিদ কোসোমার সম্পর্কে 'The Grammarians Funeral' শীর্ষক কবিতাতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন ইংরেজ কবি— রবার্ট ব্রাউনিং। অস্ট্রিয়া ও জার্মানির দ্বারা হাঙ্গেরির মুক্তিকামী জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হ্যাপসুবর্গ সাম্রাজ্যের পাশাপাশি ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণমূলক নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন গণতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রবক্তা— আলেক্সান্দর কোসোমা দে কোরোস। দুই হাঙ্গেরীয় বুদ্ধিজীবী ডাঃ গ্রিগেলি ওরোসেৎজ আর ডাঃ অ্যাগনেস কিলেসিনেয়ি জানিয়েছেন— লাতিন ও গ্রিক ভাষার পাশাপাশি সংস্কৃত, হিন্দি ও তামিল ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন কোসোমা দে কোরোস। স্থলপথে ও জাহাজে করে রোমানিয়ার ট্রান্সিলভ্যানিয়া ও বুখারেস্ট, লেবাননের বেইরুত, সিরিয়ার আলেপ্পো এবং অধুনা পাকিস্তানের পেশাওয়ার হয়ে ভারতের মাটিতে পা রাখেন আলেক্সান্দর কোসোমো দে কোরোস। এই পেশাওয়ারেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় পঞ্জাব কেশরী রঞ্জিৎ সিংহের সৈন্যদলে কর্মরত দুই ফরাসি আধিকারিক— জঁ-ফ্রাঁসোয়া আইয়ার্দ এবং জঁ-বাপ্তিস্ত ভেঁতুরার সঙ্গে। তাঁদের সাহায্যে ১৮২২ সালের মার্চ মাসে লাহোরে পৌঁছান কোসোমা দে কোরোস। অবশ্য, কারাকোরাম মরুস্থলী অতিক্রম করার বাসনা পূরণ হয়নি কোসোমা দে কোরোস-এর। তবে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্যারাভান অফিসার উইলিয়ম ম্যুরক্রফ্‌ট-এর নেকনজরে পড়েন ১৪টি ভাষায় সুপণ্ডিত কোসোমা দে কোরোস। ম্যুরক্রফ্‌ট-এর উৎসাহে তিব্বতীয় ভাষা শিখে ওই ভাষায় অভিধান ও ব্যাকরণ লিখলেন কোসোমা দে কোরোস। এই ব্যাপারে কোসোমা দে কোরোসকে সাহায্য করলেন তিব্বতীয় বুদ্ধিজীবী সাংস-রিইগিইয়াস ফুনৎশোগ। এভাবেই এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাণপুরুষ স্যার উইলিয়ম জোন্‌স্ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদক চার্লস উইলকিন্‌সকে সংস্কৃত শিখতে সাহায্য করেছিলেন পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বাচস্পতি।

কোসোমা দি কোরোস ১৮৩৪ সালে, কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক পদে থাকাকালীন ইঙ্গ-তিব্বতীয় ডিকশনারিটিকে ছেপে প্রকাশ করেন। কলকাতায় কর্মরত অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রের ওপরও বেশে কয়েকটি নিবন্ধ, বিভিন্ন ভারতীয়, ইংরেজি ও হাঙ্গেরীয় ভাষায় লেখেন কোসোমা দে কোরোস। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনীটি লেখেন থিওদোর দ্যুকা এবং ভারতের প্রথম মহিলা চিত্রকর অমৃতা শেরগিল-এর পিতৃব্য তথা ভারতবিদ-আরভিন বেকতাই। ▯

# জ্ঞানবাপী : মামলার আগে পঞ্চকন্যার প্রস্তুতি

**দুর্গাপদ ঘোষ**

প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর একটা ব্যাপার থাকে। মজুত রাখতে হয় জ্বালানিও। ঘি, তেল যাইহোক না কেন। যজ্ঞ করার আগে তার সমিধ বা উপকরণাদি সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। নাহলে অসময়ে প্রদীপ বাবা (শিবলিঙ্গ) বেরিয়েছেন। নন্দীর প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। বারাণসী জেলা আদালতে শেষ পর্যন্ত ফয়সালা কী হবে কিংবা তারপর উচ্চতর আদালতাদিতে মামলা গড়াবে কিনা তা এখন ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু ইতিমধ্যে এই মামলার সুবাদে ওই মসজিদের মধ্যে যেসব অংশে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এবারও গত ৬ মে থেকে কোর্ট কমিশনের মাধ্যমে সার্ভের অনুমতি দেবার জন্য বারাণসী সিভিল জজ রবি কুমার দিবাকরকে একটা মুসলমান সংগঠন হুমকি দিয়েছে। ফলে তাঁর নিরাপত্তা বাড়াতে হয়েছে।

লক্ষ্মী দেবী | রেখা পাঠক | সীতা সাহু | মঞ্জু ব্যাস | রাখী সিংহ

স্তিমিত কিংবা নির্বাপিত হয়ে যেতে পারে। মাঝপথে অসমাপ্ত থেকে যেতে পারে যজ্ঞ। কাশীবিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন জ্ঞানবাপী মসজিদের মধ্যে অবস্থিত শৃঙ্গার গৌরী এবং অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তির পূজার্চনা করার দাবিতে বারাণসী সিভিল কোর্টের দ্বারস্থ হবার আগে তেমনি অনেক বছরের একটা প্রস্তুতি ছিল আবেদনকারী পাঁচজন ভক্তিমতী মহিলার। যাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্যা হলেন লক্ষ্মীদেবী। এ ব্যাপারে মুখ্যত তাঁর চেষ্টায় সবাই মিলে প্রশংসনীয় সাংগঠনিক কুশলতার পরিচয় রেখেছেন। তবে সবটার পিছনে রয়েছেন লক্ষ্মী দেবীর স্বামী মোহনলাল আর্য। কোর্ট কমিশন পরিচালিত সার্ভের সময় এই মসজিদের মধ্যে পরতে পরতে হিন্দু চিহ্ন এমনকী সেখানকার ওজুখানার মধ্যে যে 'শিবলিঙ্গ' মিলেছে বলে জানা যাচ্ছে সেটাও শ্রীআর্য একেবারে খুব কাছ থেকে নিজের চোখে দেখেছেন। বাইরে এসেই বলেছেন, 'পানি নিকলা, বাবা নিকলা। নন্দী কা ইন্তেজার খতম হুয়া'— জল বেরিয়েছে, হিন্দু নিদর্শনের কথা প্রকাশ্যে চলে এসেছে তাতে যাকে বলে ওই সলতে পাকানো কিংবা যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহের কাজটা যে তাঁরা বেশ সুচারুভাবেই সম্পন্ন করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে যে জ্ঞানবাপী মসজিদের মধ্যে অবস্থিত দেব-দেবীর মূর্তির পূজার্চনা এবং হিন্দু নিদর্শনগুলোর যাতে কেউ ক্ষতি না করতে পারে সেজন্য বিপক্ষদের এই মসজিদের মধ্যে ঢুকতে না দেবার দাবিতে ২০২১ সালের ১৮ এপ্রিল পাঁচজন মহিলা বারাণসী সিভিল কোর্টে আবেদন করেন। কিন্তু তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ১৯৮৪ থেকে। বারাণসী জেলা আদালতে মামলা শুরু হয় ১৯৯৫ সালে। তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেই জেলা আদালত ১৯৯৬ সালের মে মাসে কোর্ট কমিশনের মাধ্যমে সার্ভে করানো শুরু করেছিলেন। কিন্তু মসজিদের বাইরের অংশের সার্ভের পরই মসজিদ পক্ষের বিরোধিতার কারণে ভেতরের

মোহনলাল আর্যর কথামতো, অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পুরুষ বর্তমানে ব্রহ্মলীন মহন্ত রামচন্দ্র দাস পরমহংসের ভূমিকায় তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। তখন থেকে তিনি ও তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী জ্ঞানবাপী মসজিদের মধ্যে অবস্থিত দেব-দেবীর পূজার্চনা কীভাবে করা যেতে পারে তার চিন্তাভাবনা ও চেষ্টাচরিত্র শুরু করেন। ১৯৮৪ থেকে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথাবার্তা ও বৈঠকাদি চালাতে থাকেন। কেউ কেউ তাঁদের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে সাহায্যও করেন। একজন সাধারণ ব্যবসায়ী হয়েও আদালতে মামলা-মোকদ্দমা করতে গেলে যে প্রামাণ্য তথ্যপাতির দরকার হয় এটা তাঁরা ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে বারাণসীর বৈদিক শিক্ষা কেন্দ্রের বরিষ্ঠ শাস্ত্রীজীর কাছ থেকে এই মসজিদের মধ্যে হিন্দু নিদর্শন কী কী আছে না আছে তা বিশদভাবে জানতে পারেন। কিন্তু ১৯৯৬ সালে মুসলমানদের বাধার কারণে সার্ভে বন্ধ হয়ে

যাওয়ায় তাঁদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তবে তাতে হতাশ না হয়ে বা দমে না গিয়ে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যেতে থাকেন। এরপর ২০১৮-১৯ সালে তাঁরা মথুরায় গিয়েছিলেন। সেখানে কৃষ্ণ জন্মস্থান দর্শন করা ছাড়াও বিশ্ব বৈদিক সনাতন সঙ্ঘ (ভিভিএসএস)-এর প্রধান জিতেন্দ্র সিংহ বিসেন-এর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে নামকরা আইনজীবী হরিশঙ্কর এবং তাঁর আইনজীবী পুত্র বিষ্ণুশঙ্কর জৈনর। আর্য দম্পতি যখন দুই অ্যাডভোকেটকে তাঁদের অনেক দিনের ইচ্ছা ও চেষ্টার কথা জানান তখন তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করতে রাজি হন। সেই সূত্রে তাঁদের মাধ্যমে ২০২১ সালের ১৮ এপ্রিল সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) রবি কুমার দিবাকরের এজলাসে মামলা রুজু করা হয়।

সলতে পাকানো বা যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ করার কাহিনি কেবল এইটুকুই নয়। আবেদনকারী পঞ্চকন্যার মধ্যে রাখী সিংহ যদিও বারাণসীবাসী নন, থাকেন দিল্লিতে কিন্তু যোগাযোগক্রমে তিনি হলেন উল্লেখিত শ্রীবিসেনের ভাইঝি। কালেভদ্রে বারাণসীতে আসেন। এবং এলেই কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়ে পূজার্চনা করেন। বাকি চারজন অবশ্য বারাণসীর বাসিন্দা। তাঁরা যখন রাখী সিংহের পরিচয় জানতে পারেন তখন লক্ষ্মীদেবীরা মন্দির পরিসরে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করে তাঁকেও এই মামলার অন্যতম আবেদনকারী হতে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, এইসব ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ও অগ্রণী ছিলেন শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী।

**লক্ষ্মীদেবী :** ৬৬ বছর বয়সি এই ভক্তিমতী তাঁর স্বামী সোহনলাল আর্যর 'ইচ্ছা, প্রচেষ্টা তথা 'সংগ্রাম'-এ যারপরনাই অনুপ্রাণিত হয়ে একাগ্রভাবে মনস্থির করেন যে, যেভাবেই হোক, যতদিনই লাগুক, জ্ঞানবাপীর মধ্যে অবস্থিত শৃঙ্গার গৌরী ছাড়াও অন্যান্য দেব-দেবীরও নিত্য পূজার্চনার ব্যবস্থা করতেই হবে। অচিরে এটা তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। 'আমার জন্ম মুম্বাইয়ে। বিয়ে হয়েছে বারাণসীর ছোটোখাটো একটা ছাপাখানার মালিকের সঙ্গে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো করতে গিয়ে যখন দেখলাম জ্ঞানবাপীর মধ্যে দেবী পার্বতী, গণপতি বাপ্পা, বজরঙ্গবলীজী প্রমুখ বিগ্রহের পূজার্চনা করতে দেওয়া হচ্ছে না তখন মনে বড়ো ব্যথা অনুভব করি। সেই সঙ্গে ছাপাখানার ব্যবসা চালিয়েও আমার স্বামীর 'সংগ্রাম' করা দেখে নিজেকে যেন স্থির রাখতে পারছিলাম না। মনে মনে ঠিক করলাম মন্দিরে রোজ পুজো দিতে গিয়ে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে কথা বলব।' লক্ষ্মীদেবী আরও বলেন যে সেই থেকে তাঁর স্বামী এবং তাঁর নিজের এই মিশন নিয়ে তিনি যখন যাঁকে সামনে পেয়েছেন তাঁকেই বোঝাবার এবং অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিষয়টা স্পর্শকাতর এবং এর মধ্যে আইনি জটিলতার জন্য অনেকের ইচ্ছা থাকলেও মাত্র কয়েকজনকে ছাড়া তেমন কাউকে সঙ্গে পাননি।

**রেখা পাঠক :** লাট ভৈরব মন্দিরের মহন্তর কন্যা। জানিয়েছেন যে, লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে কথা হবার পর থেকেই মনে হয়েছে এতদিন তিনি যাঁকে খুঁজছিলেন তাঁকে পেয়ে গেছেন। 'এরপর থেকে প্রায়ই বিশ্বনাথ মন্দিরে যাওয়া শুরু করি। প্রতি বছর চৈত্র নবরাত্রির চতুর্দশীতে একসঙ্গে জ্ঞানবাপীর মধ্যে শৃঙ্গার গৌরীর পুজো করতে যাওয়া-আসার পথে সেখানে অন্যান্য বিগ্রহের দিকে নজর করার চেষ্টা করে যেতে থাকি। বেরিয়ে এসে তা নিয়ে আলোচনাও চলতে থাকে।' কিন্তু মাত্র এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে শৃঙ্গার গৌরীর পুজো দিয়ে বেরিয়ে আসতে হয় একথা জানিয়ে তিনি বলেন যে, তার মধ্যেই সবকিছু খুব খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হতো না।

**সীতা সাহু :** নিজে একটা মুদিখানার দোকান চালান। তাঁর কথায়, 'বছরে মাত্র একদিনই শৃঙ্গার গৌরীর পূজার্চনার অনুমতি মেলে। ফলে ভক্তদের ভিড় এবং সময় খুব কম পাওয়ায় মনে যেন শান্তি পাচ্ছিলাম না। ক্রমে এটা অসহ্য হয়ে উঠছিল। মনে মনে নিত্য পুজোর জন্য ছটফট করছিলাম। এমন সময় বিশ্বনাথ মন্দিরে লক্ষ্মীজীর সঙ্গে কথা হয়। তখন থেকে শিবলিঙ্গের অর্চনার পর মন্দির পরিসরে বসে প্রায় দিনই আমরা আলোচনা করতাম। রোজ কেন দেবী পার্বতীর পুজো করতে পারব না তা নিয়ে প্রত্যেকেই প্রশ্ন তুলতাম। আলোচনা ও প্রশ্ন ইচ্ছা করেই বেশ জোরে জোরে করতাম যাতে অন্যদের কানে যায়। দেখতাম অনেকেই থমকে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছেন। তাঁদের চোখমুখ দেখে বুঝতে পারতাম আমরা যা চাইছি তাঁরাও তা চান।'

**মঞ্জু রায় :** বিশ্বনাথ গলিতে অবস্থিত একটা দোকানের মালিকের স্ত্রী মঞ্জু ব্যাস আদতে আদি বিশ্বেশ্বর মন্দির পরিসরে এক সময়ের বাসিন্দা ব্যাস পরিবারের কন্যা। তাঁর পিতৃ পরিবারের এক্তিয়ারের এখনো জ্ঞানবাপী মসজিদের ৪টে 'তহখানা' (Basement)-র একটা রয়েছে বলে দাবি করেছেন এই পরিবারের বর্তমান কর্তা যিনি 'ব্যাসজী' পরিচয়ে খ্যাত। শ্রীমতী মঞ্জুদেবীর স্বামী কেবল একজন ব্যবসায়ীই নন, একজন সমাজসেবীও। মঞ্জুদেবীর বক্তব্য, 'বছরে মাত্র একদিনের জন্য শৃঙ্গার গৌরীর পূজার্চনার অনুমতি থাকায় প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়ে থাকে। কয়েক বছর আগে একবার অনেক কষ্ট করে দরজার কাছাকাছি পৌঁছেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল। কারণ আর সময় দেওয়া হয়নি। সেদিন চৌকাঠ থেকে কোনোরকমে দর্শন ও প্রণাম করে ফেরার সময় মনে হতো আমার ইষ্ট দেব-দেবীর পূজার্চনা রোজ করতে পারব না কেন? কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে একদিন হঠাৎই দু'তিনজন মহিলাও এ নিয়ে আলোচনা করছেন শুনতে পেলাম। থমকে দাঁড়ালাম। লক্ষ্মীদিদি ডেকে বসালেন। আমি ব্যাস পরিবারের মেয়ে শুনেই পুলকিত হয়ে উঠলেন। তারপর থেকে আমাদের চারজনের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা এবং উপায় বার করা নিয়ে কথাবার্তা চলত। শ্রীহরিশঙ্কর এবং শ্রীবিষ্ণুশঙ্কর জৈনজী মামলা দায়ের করতে রাজি হওয়াতে আমরা যেন অকূল দরিয়ায় নাও দেখতে পেলাম।'

**রাখী সিং :** দিল্লিবাসী হলেও তিনি যেহেতু বিশ্ব বৈদিক সনাতন সঙ্ঘের প্রধানের ভাইঝি, সেজন্য লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তাঁর নিয়মিত বৈঠকাদি হয়তো হতো না কিন্তু ফোনে ফোনে প্রায়ই কথা হতো। মানসিকভাবে তৈরিই ছিলেন। আর দুই অ্যাডভোকেট যেহেতু শ্রীবিসেনের খুব ঘনিষ্ঠ, সেজন্য এই মামলায় অংশ নিতে কোনো দ্বিধা বা বিলম্ব করেননি। 'আমরা এখন কিছুটা হলেও ইতিবাচক ফল পেয়েছি। আশা করছি ভগবান আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।' সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, এই মামলার মুখ্য আবেদনকারী হলেন তিনিই। মামলার টাইটেল হলো, রাখী সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার।

# রেকর্ড সংখ্যক মানুষ উত্তরবঙ্গের রামকেলি মেলায়

**তরুণ কুমার পণ্ডিত।।** অতিমারী করোনা কাটিয়ে বিগত দু'বছর পর এবার মালদা জেলায় উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ রামকেলি মেলা অনুষ্ঠিত হলো ঐতিহাসিক গৌড়ের পিয়াসবাড়িতে। ৫০৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী এই মেলা বৈষ্ণব তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত এই মেলায় প্রতিবছর বহু দূর দূর থেকে ভক্তদের সমাগম হলেও এবার রেকর্ড সংখ্যক মানুষ এই মেলায় উপস্থিত হয়ে নাম সংকীর্তন, বাউল সংগীত ও কেনাকাটায় অংশগ্রহণ করেছিল। এবারে মালদায় তেমন আমের ফলন না হওয়ায় সুদূর অসম, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, ঝাড়খণ্ড থেকে আগত তীর্থযাত্রীরা নামমাত্র আমের স্বাদ পেয়েছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে প্রতিবছরই এই রামকেলি মেলার শুরুতে ঝাড়খণ্ড, বিহার ও ওড়িশার মহিলারা এখানে আসেন গৌড়েশ্বরী বা গয়েশ্বরী মন্দিরে (মাতৃগয়া) মাতৃকুলের পিণ্ড দানের জন্য। জনশ্রুতি, ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র এবং মাতা সীতাদেবী ভ্রাতা লক্ষ্মণকে নিয়ে বনবাসে থাকাকালীন এখানেই মাতৃকুলের পিণ্ড দান করেছিলেন। আর এখানে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব ও খেলা করার জন্যে এই স্থানটি রামকেলি নামে পরিচিত হয়।

গৌড় নগরীতে কোটি কোটি লোক না থাকলেও সেইসময়ে গৌড় ছিল বিশাল শহর। তার আয়তন ছিল বারো মাইল লম্বা ও পাঁচ মাইল চওড়া। সমগ্র ভারতে গৌড়ের মতো এত বড়ো শহর দু' চারটে ছিল। সেই শহরে ভক্ত নর-নারীরা কীভাবে ছুটে এসে হরিনামে মাতোয়ারা হয়েছিলেন, হুসেন শাহ তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মুসলমান বাদশাহ বলতে বাধ্য হয়েছিল, চৈতন্য মহাপ্রভু আপনি যেখানে ইচ্ছা থাকুন, আপনারা শাস্ত্র মতে কীর্তন করুন— কাজি, কোটাল কিছু বললে আমি তাদের যথাযথ শাস্তি দেবো। বৈষ্ণবীয় ভক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাই রামকেলী এক অনুপম ও পবিত্র তীর্থক্ষেত্র।

জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তীর আগের দিন থেকেই তীর্থযাত্রীদের আগমন ঘটে এই রামকেলি ধামে। যেহেতু এই স্থানটি 'গুপ্ত বৃন্দাবন' হিসেবে পরিচিত, তাই বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধু সন্ন্যাসীরা আগে থেকেই বিভিন্ন আখড়া তৈরি করে বসে পড়েন। রামকেলিতে প্রবেশ করলেই চৈতন্য মহাপ্রভুর আবক্ষ মূর্তির পাশে কেলি কদম্ববৃক্ষ এবং তমাল বৃক্ষ চোখে পড়বে। এই প্রাচীন বৃক্ষের নীচে মহাপ্রভু আপামর জনসাধারণকে হরিনাম সংকীর্তন প্রদান করেছিলেন এবং রূপ সনাতনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এখানেই রয়েছে একটি ছোট্ট পাথরের উপরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদচিহ্ন। এছাড়াও রামকেলীতে আগত তীর্থযাত্রী শ্রীরাধা মদনমোহন মন্দির, শ্যাম কুণ্ড, রাধা কুণ্ড ও অষ্ট কুণ্ড, শ্রীরূপ ও শ্রী সনাতন গোস্বামীর তৈরি সরোবর রূপসাগর ও হাবাসখানা ঘাট, যেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্নান ও বিশ্রাম করেছিলেন।

এবারে মালদা জেলা প্রশাসন রামকেলি মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের যাতায়াত, ভিড় সামলানো ও নিরাপত্তার জন্য প্রচুর পুলিশ ও সিভিক মোতায়েন করেছিল। যাত্রীদের পানীয় জল, থাকা, চিকিৎসা ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করেছিল জেলা পরিষদ। এছাড়া ২৫টি বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা ও কীর্তনের আসর থেকে যাত্রীদের থাকা ও খাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে মেলার প্রথম দিনে ৩৫০০ মানুষকে পানীয় জল ও বাতাসা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন আখড়ায়ও তারা খাদ্য পরিবেশেন করেছেন। এবারে মেলায় প্রথম দুদিন বৃষ্টি না হওয়ায় তীর্থযাত্রীদের তেমন কোনো অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়নি। তবে মেলায় আগত ভক্তদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে তারা কষ্ট সহ্য করেই রামকেলি ধামে এসে পুণ্য অর্জন করতে চান। □

# শিতাংশু গুহর ‘করোনার কথা’ প্রসঙ্গে

**ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য**

গত ৫ জুন ২০২২ তারিখ শিতাংশু গুহর দুটো গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে তা হয়ে উঠল না। দুটি পুস্তকের মধ্যে একটি পুস্তক ‘করোনার কথা’। এ পুস্তকে তাঁর লেখাগুলো করোনা কেন্দ্রানুগ। এ মহাদুর্যোগময় সময়ে কী ঘটেছে এবং প্রবাসে অবস্থানরত বাঙ্গালি কীভাবে দুর্যোগ মোকাবিলা করেছেন তার তথ্যনির্ভর বর্ণনা রয়েছে এ গ্রন্থে। এ বইটিতে বহু ঘটনার বর্ণনায় লেখক অত্যন্ত সহজ ভাষায় মানুষের অন্তরাত্মার অভিন্ন মানসপট তুলে ধরেছেন। প্রবাসে অবস্থানরত বাঙ্গালি সবকিছু ভুলে গিয়ে অপরের পাশে থেকেছেন, মৃতের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছেন এবং কোভিডের থাবা থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষকে পুনরায় দাঁড়াতে শক্তি জুগিয়েছেন। লেখক এ ঘটনাগুলোর ভাবাবেগ বিবর্জিত উপস্থাপনার মাধ্যমে বাঙ্গলি মানসকে সঠিকভাবে চিত্রায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন।

মমত্ববোধ, অন্তর নিঃসৃত আবেগ ও অনুভূতির ছোয়া দুঃখ ও বেদনার মধ্যে নিজের জনকে পেয়ে আর্ত ও অসহায় মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও বহু মানুষ করোনায় আক্রান্ত রোগীদের সেবায় এগিয়ে এসেছেন। এবিষয়গুলো লেখকের বাছাইকৃত ঘটনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে। সমাজে আবুল বাশারের মতো মানুষ আছেন যারা ভিন্ন ধর্মের অনুসারী মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন। সমাজে সাধন দাসের মতো নীরবে নিভৃতে নরনারায়ণের সেবায় নিয়োজিত নিষ্কামকর্মী লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। বইটি ছোটো আকারের হলেও কোভিড-১৯ জনিত মহাদুর্যোগকালে নিউ ইয়র্ক শহরে মানুষের দুঃখ ও বেদনার করুণ চিত্র বিধৃত হয়েছে। শ্রীমতী সুজাতা চৌধুরীর ঘটনা লেখক অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রিয় স্বামীর মৃতদেহ এক কক্ষে, অন্য কক্ষে ‘একই রোগে আক্রান্ত তিনজন মানুষ বসে আছেন’ এক অজানা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য। এ মর্মস্পর্শী ঘটনা

প্রতিটি পাঠকের দেহস্থ প্রাণকোষে আঘাত করে। এ জাতীয় হৃদয়বিদারক ঘটনা একটি নয়, বহু।

প্রবাসে বাঙ্গালি সমাজ মানবতার সেবায় বহু ঝুঁকি নিয়ে নিজের ও পরিবারের কথা না ভেবে অসহায় ও বিপন্ন মানুষের পাশে থেকেছেন। তাঁরা কোভিডকে জয় করার জন্য নিরলস সংগ্রাম করেছেন। এগুলোর নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে এই বইটিতে। নিজের ধূমপানের নেশা পূরণের জন্য যে নিষ্কাম কর্মী বাহিনীকে ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে তাও লেখক উল্লেখ করেছেন। একইভাবে জীবনকে তুচ্ছ করে বহু সমাজকর্মী রাতদিন সেবা দিয়েছে। সে সঙ্গে এমন ঘটনাও ছিল যে, হাসপাতালে ৮২ বছরের বৃদ্ধ করোনা থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন এবং হাসপাতাল থেকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পরিবারের লোকজন তাকে নিতে চায়নি। অবশ্য ডাক্তার তাদের বুঝানোর পর তারা সম্মত হয়। বিচিত্র ঘটনার মধ্যে এটি স্পষ্ট যে, উত্তম ও অধমের সংমিশ্রণেই এই সমাজ। অসহায় মানুষের সেবায় নিষ্কাম কর্মীর অভাব হয় না, একইভাবে অমানবিক আচরণ সম্পন্ন মানুষও থাকে। বইটিতে নির্মোহভাবে লেখক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন।

এক-দু’টি ঘটনা বাদে বইটির মোট ৬১টি অনুচ্ছেদ পড়লে মনে হয় যে, মানুষ মানুষের জন্যে। মহাদুর্যোগের সময় ধর্ম, বর্ণ ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে মানুষ কীভাবে পারস্পরিক সাহায্যে আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তার বিবরণ লেখক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। মহাদুর্যোগের কালোদিনগুলোতেও মানুষের অন্তরাত্মার তাগিদ যে এক এবং অভিন্ন তা তাঁর বর্ণনায় ফুটে উঠেছে।

নির্ভুল ছাপা, মেক-আপ, ফন্ট নির্বাচন ও সার্বিক উপস্থাপনা বইটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী জনাব ওসমান গনির রুচিবোধ ও সৃজনশীল কর্মে তাঁর অঙ্গীকার এ প্রকাশনাকে সম্ভব করেছে। সামাজিক বিবর্তনের ক্রমধারায় ‘করোনার কথা’ বইটি একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শিতাংশু গুহর লেখা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কাম্য।

**পুস্তকের নাম : করোনার কথা।**
**লেখক : শিতাংশু গুহ।**
**প্রকাশক : আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।**
**মূল্য : $ 400/00।**
**প্রাপ্তিস্থান : অনলাইনে Rocomari.com**

# পুরুলিয়ার শিক্ষার দিশারি
# ‘পুঁথি দাদু’ গুরুচরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** নিদারুণ অভাব অনটনের জন্য স্কুলের গণ্ডি পেরোতে পারেননি গুরুচরণ। সপ্তম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরপরই ইতি টানতে হয়েছিল পড়াশোনায়। তারপর আর প্রথাগত শিক্ষার উঠোনে পা পড়েনি তাঁর। তা বলে শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরে যাননি দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করা এই শিক্ষাযোদ্ধা। অদম্য জেদ আর নাছোড় মনোভাবের ফলে পড়ে ফেলেছেন হাজার হাজার পাতার বই। নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন জ্ঞানের ভাণ্ডারে। আর আজ স্কুলজীবনে থমকে যাওয়া সেই হতদরিদ্র গুরুচরণ গড়াইয়ের কাছে টিউশন নিতে আসে স্নাতক থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তরের পড়ুয়ারা। বাগমুণ্ডি থানার বুরদা গ্রামের সবার কাছে তিনি পরিচিত ‘পুঁথি দাদু’ নামে।

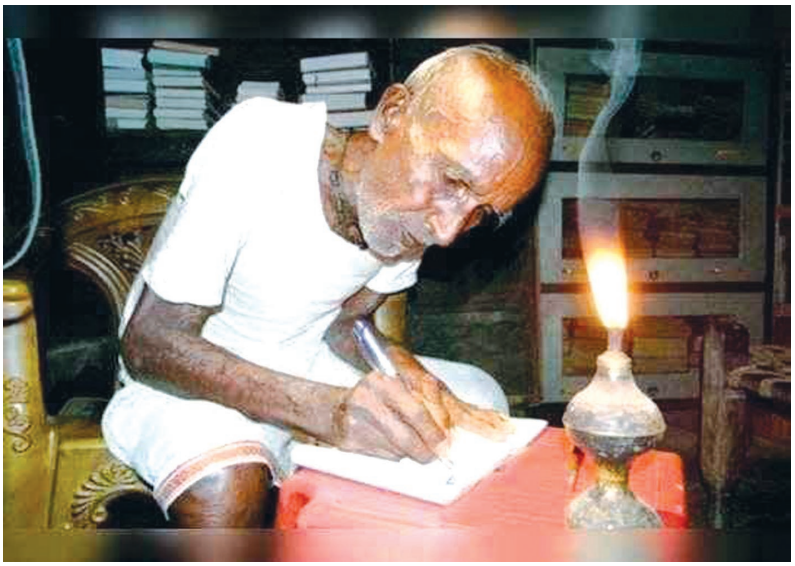

তখন মাত্র ১১ বছর বয়েস। মারা গেলেন গুরুচরণের বাবা। দারিদ্র আর অভাব তখন থেকেই টের পেলেন গুরুচরণ। বন্ধ হলো স্কুলে যাওয়া। কিন্তু দিশেহারা জীবনের উথাল পাথাল দিন যাপনের মধ্যেও বইয়ের প্রতি তাঁর অনুরাগে এতটুকুও ভাঁটা পড়েনি। পাড়াপড়শী, ক্লাবঘর অথবা জনৈক মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে বই আনতেন গুরুচরণ। মা ফুটিবালা নিরক্ষর হলেও বইয়ের কদর জানতেন। ছাপোষা সংসারে ধান বিক্রির টাকাতেও বই কেনা হতো ছেলে গুরুচরণের জন্য। স্কুলছুটের ঠিক তিন বছরের মাথায় বাড়িতেই একটা ছোট লাইব্রেরি গড়ে তোলেন গুরুচরণ। নাম দেন ‘চৈতন্য গ্রন্থাগার’। সারাদিন চাষবাসের পর মাঠ থেকে ফিরেই বই নিয়ে বসতেন। পাশাপাশি চলতো গ্রন্থাগারের জন্য বই সংগ্রহের কাজও।

একসময় স্থানীয় বাচ্চাদের পড়াতে শুরু করলেন। শিক্ষক হিসেবে গুরুচরণের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। পাশাপাশি অবসর যাপনের জন্য ছিল সাহিত্যচর্চা। ‘কোরক’ নামে একটি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। আজীবন বিদ্যার সাধনা করে গেছেন এই মানুষটি। আজও তাঁর সংসার চলে টেনেটুনে। গুরুচরণের দুই ছেলে চাষবাস করেন। সংসারে প্রবল অনটনের মধ্যেও শিক্ষাচর্চায় বাবাকে উৎসাহ জোগায় ছেলেরা। নিরলস শিক্ষা সাধনায় রত ৭৮ বছরের গুরুচরণ গড়াই কবে যে সকলের কাছে ‘পুঁথি দাদু’ হয়ে উঠলেন তা নিজেই জানেন না। সে কথা উঠলে বলেন, ‘‘বাগমুণ্ডির মানুষ আমায় ভালোবাসে বলেই ওইনামে ডাকে। শিক্ষার কোনও শেষ নেই। আমি তো কয়েকটা নুড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি মাত্র।’’

পেশায় কৃষক পুঁথি দাদুর কাছে পড়তে আসেন স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের ছাত্র-ছাত্রীরাও। প্রথাগত ডিগ্রি নেই, না আছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি! তবু কী অনায়াস দক্ষতায় উচ্চশিক্ষায় পাঠ নেওয়া পড়ুয়াদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সহজে বলে দেন তিনি। গবেষণার কাজে সাহায্য পেতে অনেকেই পুরুলিয়ার বাগমুণ্ডি থানার বুরদা গ্রামে পুঁথি দাদুর চৈতন্য গ্রন্থাগারে ছুটে আসেন। সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন থেকে সাধারণ জ্ঞান— সব বিষয়ের মুশকিল আসান পুঁথিদাদু ও তাঁর গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারে বইয়ের সংগ্রহ এক হাজারেরও বেশি। এখানে যে কেউ চাইলেই বই পড়তে আসতে পারেন। গুনতে হয় না কোনও মূল্য। পড়াশোনায় সাহায্যের জন্য সবসময় কোমর বেঁধে তৈরি গুরুচরণ। কোন্ বইয়ের কোন্ পাতায় কী লেখা রয়েছে সবই তাঁর নখদর্পণে। ছেলে পড়িয়ে যে কটা টাকা আসে সবটাই খরচ হয়ে যায় ওই গ্রন্থাগারের পিছনে।

গুরুচরণের বড়ো ছেলে শিবরাম জানান, ‘‘সংসারে যতই দারিদ্র থাকুক, বাবাকে তাঁর পড়াশোনায় কখনো বাঁধা দিই না। মানুষটা পড়াশোনা অন্ত-প্রাণ।’’ গাল ভর্তি খোঁচা দাড়ি। পরনে আধময়লা ধুতি আর গেঞ্জি। শরীরে দৈন্যতার ছাপ নিয়েই সারস্বত সাধনায় মেতেছেন বুরদা গ্রামের পুঁথি দাদু। সাদামাটা জীবন কাটানো এই মানুষটাকে নিয়ে গর্বের শেষ নেই এলাকাবাসীর। বুরদা গ্রামের সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেন, পুঁথিদাদু আর তাঁর চৈতন্য লাইব্রেরি না থাকলে গ্রামের বহু ছেলে-মেয়েকেই পড়াশোনা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতো। কেউ তাঁকে ডাকে পুঁথির সাগর বলে। কেউ বলে চলমান এনসাইক্লোপিডিয়া। তবে এতসব বিশেষণের মধ্যেও সদা নির্বিকার গুরুচরণ গড়াই। কী দিলাম আর কী পেলাম, সেসব অঙ্ক মেলাতে বসার ফুরসত নেই তাঁর। বুরদা গ্রামের আলো-আঁধারি সন্ধ্যায় দুয়ারে বসে কুপির আলোয় একটি বইয়ের পাতা তুলে ধরে বিড়বিড় করে বলেন, ‘‘জীবন একটি পর্বত। আপনার লক্ষ্য আপনার পথটির সন্ধান করা। শীর্ষে পৌঁছানো নয়।’’ □

# মহাপ্রস্থান

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রায় ছত্রিশ বছর কেটে গেছে। রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য পালন করছেন। হঠাৎ একদিন সংবাদ এল শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেছেন। এ সংবাদে পাণ্ডবদের মনে দুঃখের আর সীমা রইল না। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁদের পরম বন্ধু, সখা, পরামর্শদাতা ও গুরু।

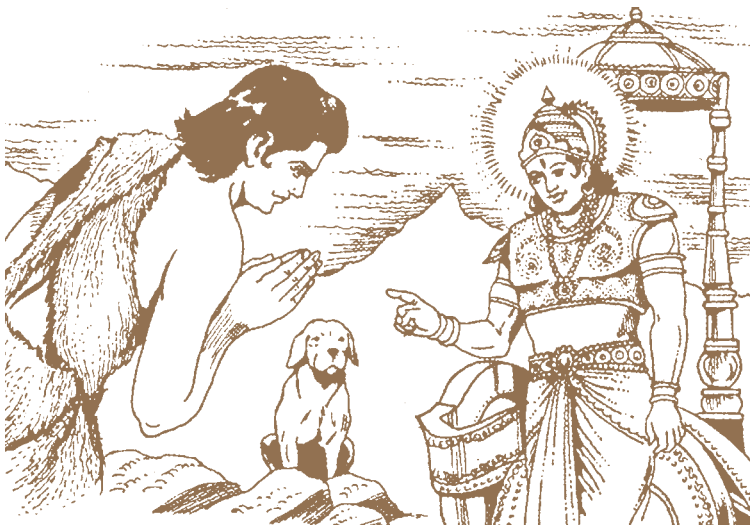

অর্জুনকে তখনই দ্বারকায় পাঠান হলো। দ্বারকা থেকে ফিরে এসে তিনি বললেন, সত্যিই কৃষ্ণ তাঁদের ছেড়ে অমরধামে চলে গেছেন। শুধু কৃষ্ণই নয়, যাদবদের অনেকেই আর নেই। শোকের কালো ছায়ায় রাজপুরী আচ্ছন্ন হয়ে গেল। রাজা যুধিষ্ঠির ভাইদের ডেকে বললেন, আর কেন, আমাদেরও যাবার সময় হয়েছে। এস আমরাও যাবার জন্য তৈরি হই। অর্জুনের নাতি পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে পাঁচভাই ও দ্রৌপদী মহাযাত্রার জন্য তৈরি হলেন। রাজপোশাক ছেড়ে তাঁরা গাছের বাকল পরলেন। পুরবাসী নর-নারী, আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁরা যাত্রা করলেন হিমালয়ের পথে মহাপ্রস্থানের জন্য।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে রাজারা বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যেতেন। মহাপ্রস্থানও একরকমের সন্ন্যাস। জীবনের প্রতি মমতা যখন একেবারে চলে যায়, তখনই মানুষ এই মহাপ্রস্থানের অধিকারী হয়। এই সময় যাত্রীকে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে করতে হিমালয়ের দুর্গম পথে চলতে হয় দিনের পর দিন। খাওয়াদাওয়ার পর্যন্ত উপায় থাকে না। এভাবে চলতে চলতে পথিকের শেষ নিঃশ্বাসটি বেরিয়ে একদিন অনন্তে মিশে যায়।

পাণ্ডবরা চলেছেন হিমালয়ের পথে। খানিকটা গিয়েই তাঁরা দেখতে পেলেন কোথা থেকে একটা কুকুর তাঁদের সঙ্গী হয়েছে। তাঁরা যেদিকে যান, কুকুরটাও সেদিকেই যায়, কিছুতেই তাঁদের সঙ্গ ছাড়ে না। ক্লান্ত পায়ে তাঁরা হিমালয়ের চূড়োর পর চূড়ো পেরিয়ে যেতে লাগলেন। শেষকালে তাঁর এক বিশাল পর্বতশৃঙ্গ সামনে দেখতে পেলেন। কারুর মুখে কথা নেই। ধীর ভাবে তাঁরা বরফ ভেঙে এগিয়ে চলেছেন। যুধিষ্ঠির চলেছেন সবার আগে। তাঁকে ডেকে ভীম বললেন, দাদা দেখুন, রানি দ্রৌপদী মাটিতে পড়ে গেলেন। একথা শুনে যুধিষ্ঠিরের চোখে জল এল, তবু তিনি ফিরে চাইলেন না। বললেন, আমাদের প্রাণের কৃষ্ণকে আমরা দেখতে চলেছি। এখন আর পেছনে তাকাবার সময় নেই। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

কিছুক্ষণ পর আবার ভীম বলে উঠলেন, দেখুন দেখুন ,সহদেবও মাটিতে পড়ে গেল। রাজার চোখে আবার জল এল কিন্তু তিনি থামলেন না। কেবল বললেন, চল চল, আমরা এগিয়ে যাই। সহদেবের পর নকুল, তারপর অর্জুন এবং অর্জুনের পর ভীমও মাটিতে পড়ে চিরকালের মতো চোখ বুজলেন। একমাত্র রাজা যুধিষ্ঠির তখন চলেছেন আর তাঁর সামনে চলেছে সেই কুকুরটি। শেষকালে তিনি সুমেরু পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠল। দেবতারা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। একখানা সুন্দর রথ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। রথ থেকে নেমে এলেন দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্র বললেন, রাজা মানুষের মধ্যে আপনিই সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ। সশরীরে কেউ স্বর্গে যেতে পারে না। আপনি একমাত্র সশরীরে স্বর্গে যাবার অধিকারী। আসুন রাজা, আপনার জন্যই এই রথ নিয়ে এসেছি আমি।

যুধিষ্ঠির বললেন, দেবরাজ, আপনার কৃপায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু আমার চার ভাই ও রানি দ্রৌপদী পথেই দেহত্যাগ করেছে। তাদের ছেড়ে আমি কীভাবে স্বর্গে যাই বলুন। দেবরাজ বললেন, তাঁরা আগেই স্বর্গে পৌঁছে গিয়েছেন। এবার আপনি আসুন আমার রথে। যুধিষ্ঠির তখন পেছন ফিরে কুকুরটিকে বললেন, এস বাছা, আমরা তাহলে রথে উঠি। এ কথায় দেবরাজ চমকে উঠে বললেন, সে কী কথা! কুকুর উঠবে আমার রথে? অশুচি অপবিত্র প্রাণীটিকে আপনি ত্যাগ করুন। যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, দেবরাজ, কুকুরটি সারা পথ আমার সঙ্গে এসেছে। কঠিন সময়েও সে আমায় ত্যাগ করেনি। একে ছেড়ে আমি যাই কী করে বলুন। আর একে যদি স্বর্গে যেতে না দেওয়া হয় তাহলে আমি সেখানে যেতে চাই না। প্রাণ থাকতে আমি আশ্রিতকে ত্যাগ করতে পারব না।

দেবরাজ আবার বললেন, রাজা আপনি পুণ্যাত্মা, পুণ্যের জন্যই আপনি স্বর্গে যাবার অধিকার পেয়েছেন। এখন যদি আপনার পুণ্যের বদলে আপনি কুকুরের পাপ গ্রহণ করেন এবং আপনার পরিবর্তে কুকুরটিকে স্বর্গে যেতে দিতে রাজি হন তাহলেই এর স্বর্গে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। আপনি কি এতে রাজি?

যুধিষ্ঠির বললেন, আমি রাজি। আমার স্বর্গে যাবার দরকার নেই। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই দেখতে পেলেন কুকুরটি আর সেখানে নেই। তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং ধর্মরাজ। ধর্মরাজ বললেন, রাজা তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্যই আমি কুকুরের রূপ ধারণ করেছিলাম। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমার মতো ধার্মিক লোক পৃথিবীতে বিরল। তোমার জন্য পৃথিবী ধন্য হয়েছে।

**(শাশ্বত ভারত থেকে)**

## ভারতের বিপ্লবী

# মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত

বিপ্লবী মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯১৫ সালের ২৭ অক্টোবর মেদিনীপুর জেলারপাহাড়িপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বেণীমাধব দত্ত। মৃগেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর টাউন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবীদলে যোগ দেন। পেডি ও ডগলাস নিহত হওয়ার পর বার্জ নামে এক ইংরেজ মেদিনীপুরের মাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন।

১৯৩৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর ফুটবল মাঠে মৃগেন্দ্রনাথ ও অনাথবন্ধু বার্জ সাহেবকে গুলি করে হত্যা করেন। কিন্তু পুলিশের গুলিতে অনাথবন্ধু ঘটনাস্থলেই এবং মৃগেন্দ্রনাথ পরদিন মৃত্যুবরণ করেন।

## জানো কি?

- মাউন্ট এভারেস্ট নেপালে অবস্থিত।
- নেপালে মাউন্ট এভারেস্টকে বলা হয় সগরমাথা।
- বাচেন্দ্রী পাল প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি এভারেস্ট জয় করেন।
- মহাভারত মহাকাব্যটি পঞ্চমবেদ নামে অভিহিত।
- পরগনা শব্দটি ফরাসি ভাষায় ব্যবহৃত হয়।
- ভারতের কুড়িটাকার নোটে (নতুন) গুহার চিত্র রয়েছে।
- পাখি অনেকক্ষণ আকাশে উড়তে পারে ফুসফুসে বায়ুথলির জন্য।

## ভালো কথা

### ডাক পায়রা

সেদিন সন্ধ্যায় বাবা, মা,দাদা ও আমি বাইরে বসে গল্প করছি, তখনই একটা সোনালি রঙের বেশ মোটাসোটা পায়রা ঝপ করে আমাদের সামনে এসে বসে বকবকম করে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকল। দাদা একটা বাটিতে ওর সামনে জল ধরতেই চো চো করে খেয়ে নিল। বাবা ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রাখলেন। পরদিন ভোর হতেই আমরা সবাই পারাটির কাছে এলাম। বাবা ঝুড়ি তুলে এক মুটো গম পায়টার সামনে ধরতেই সেগুলি খেয়ে ফেলল। মা জলের বাটি সামনে ধরতেই বেশ খানিকটা জল খেয়ে নিল। তারপর একবার বকবকম করে আমাদের দিকে তাকিয়ে খুব তাড়াতাড়ি উড়ে চলে গেল। বাবা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, পায়রাটি কারও ডাক পায়রা ছিল। কোনো খবর নিয়ে যাচ্ছিল। সন্ধ্যা হওয়ায় আমাদের কাছে রাতটা কাটিয়ে গেল। ওরা মানুষ চেনে।

**ভার্গব আচার্য** , নবম শ্রেণী, অম্বিকাপট্টি, শিলচর, অসম।

***তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।***

## শব্দের খেলা

| *লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে* | *সঠিক ভাবে সাজাতে হবে* |
|---|---|
| (১) র ল ঙ্গ ত | (১) ৎ থা সা স ক গ রি র |
| (২) ব ণ অ র | (২) ক ছ শা কা দি ঢা মা য়ে |

**৩০ মে সংখ্যার উত্তর**

(১) পরিচারিকা (২) ছেলেছোকরা

**৩০ মে সংখ্যার উত্তর**

(১) চৈতন্যচরিতামৃত (২) প্রবলপ্রতাপান্বিত

**উত্তরদাতার নাম**

(১) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদুমপুর, মালদা। (২) সীমা সরকার, হিলি, দ: দিনাজপুর (৩) ভজন সিংহ, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি (৪) আকাশ পাত্র, স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া।

*সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।*

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

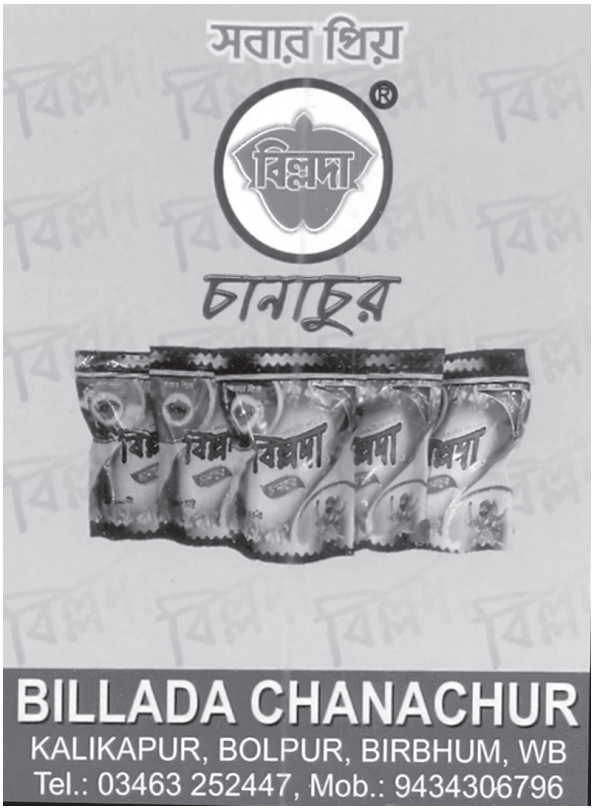


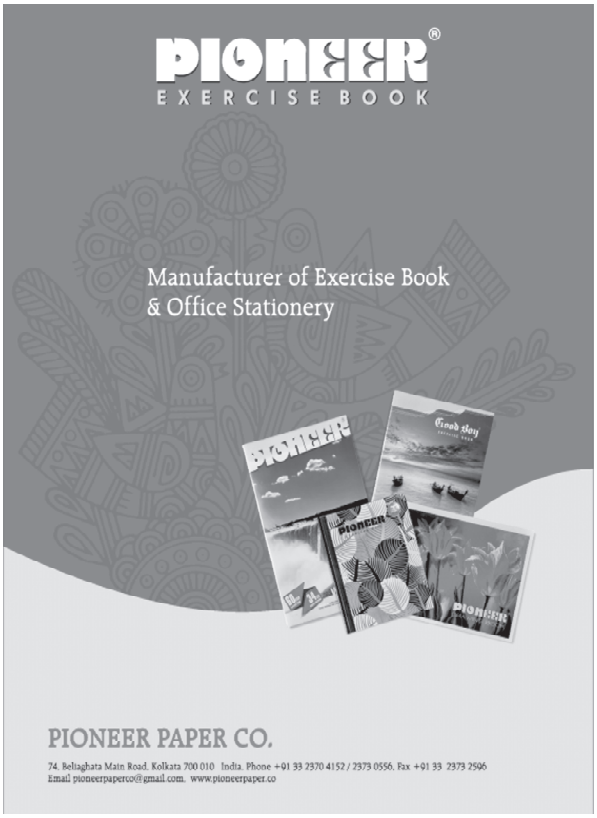


## যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

## বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের*
*ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।*
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

# পশ্চিমবঙ্গ কেবল একটি প্রদেশের নাম নয়, শত শত বছরের একটি আস্ত ইতিহাস

**কল্যাণ গৌতম**

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস ২০ জুন। বাঙ্গালি হিন্দুর বিজয় দিবস। একটি রথযাত্রার দিন। শ্যামাপ্রসাদ মুখ্যার্জি সেই রথের সারথি। তিনি পশ্চিমবঙ্গের রথ ছুটিয়ে নিয়ে দিল্লিতে চলেছেন। বাঙ্গলা মা ভারতমাতায় একাকার হবেন। পশ্চিমবঙ্গ কেবল একটি প্রদেশের নাম নয়, কেবল পূর্বতন বঙ্গপ্রদেশের পশ্চিমাংশ নয়। পশ্চিমবঙ্গ একটি ভাবনার নাম, পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালির অস্তিত্বের নাম, পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালির অস্মিতার নাম, পশ্চিমবঙ্গ এক অবর্ণনীয় ইতিহাসের নাম। মানুষ যখন প্রশ্ন করবে, 'পশ্চিমবঙ্গ' যখন আছে, পূর্ব নিশ্চয়ই ছিল, তা কোথায় গেল? যে বাঙ্গালি স্বাধীনতা আন্দোলনে এত বলিদান দিয়েছে, যে বাঙ্গালি এত ত্যাগ স্বীকার করেছে, নবজাগরণে পথ দেখিয়েছে তারই উত্তরাধিকারের নাম পশ্চিমবঙ্গ।

প্রশ্ন আসবে বাঙ্গালি কারা? বাংলা ভাষায় কথা বললেই কেউ বাঙ্গালি হয়ে যান না। ইংরেজি ভাষায় কথা বললেই কেউ ইংরেজ হয়ে যান? জার্মান ভাষায় কথা বললেই জার্মান হয়ে ওঠেন? বাংলা ভাষায় কথা বললেও তিনি বাঙ্গালি হবেন না। বাঙ্গালি হতে হলে বাঙ্গলার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়ে চলতে হয়। এই উত্তরাধিকার কয়েক হাজার বছরের পারম্পর্য। এই ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব আছেন; চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন, আছেন বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের মতো মনীষীরা। এই উত্তরাধিকারে দুর্গাপূজা আছে; দোল, জন্মাষ্টমী, গাজন, মনসাপূজা, রামনবমী আছে। এই সামগ্রিকতা যারা ভুলিয়ে দিতে চান, তারা বাংলা ভাষায় কথা বললেও বাঙ্গালি পদবাচ্য নন। যারা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অহরহ বিদেশি আরবি শব্দভাণ্ডার সঙ্গী করে কথা কন, তাদের ভাষা কী বাংলা?

সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে যে বাঙ্গালি দেশের পথ দেখিয়েছে তাকে নিমেষে ইসলামি দেশ করে ফেলার চক্রান্ত হলো। এর বিরোধিতা করার ইতিহাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হলো। আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে এলেন হিন্দু-অস্মিতার নয়নের মণি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। স্যার আশুতোষ মুখার্জির সুপুত্র; একাধারে শিক্ষাবিদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, আদ্যন্ত সেবাব্রতী, নিঃস্বার্থ এক মানুষ। রাজনীতির বাইরেও তাঁর অনবদ্য ভূমিকা। অথচ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জন্মদিনে একটি মালাও জোটে না! পশ্চিমবঙ্গ দিবসের বিশেষ দিনে আলোচনা করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টির ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার কথা, তাৎপর্যের কথা। আলোচনার পরতে পরতে শ্যামাপ্রসাদের নাম আসবে।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসের তাৎপর্য কী? তাৎপর্য হলো নির্যাতিত বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য একটি হোমল্যান্ড আদায় করার রোমহর্ষক কাহিনি। কে তার কারিগর? ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। কেন বঙ্গপ্রদেশকে ভাগ করতে হলো? উত্তর পাবো ভাগ করার

ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করে। আর তখনই পশ্চিমবঙ্গ দিবসের তাৎপর্য আমরা খুঁজে পাবো।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই পর্বে সার্বিক নেতৃত্ব দিলেন। তখন বাঙ্গলার ইতিহাসে তেমন বড়ো মাপের নেতা নেই। দেশ ত্যাগ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বাইরে গিয়ে লড়াই করার মাঝে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আমরা জানি না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পরলোকগমন করেছেন আগেই। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীর সাধনমার্গে বিরাজ করছেন। ১৯৪৭ সালে এই দিনে হিন্দু বিধায়কেরা বাঙ্গলাকে ভাগ করে 'পশ্চিমবঙ্গ' গঠনের জন্য ইতিহাস গড়লেন। বিভক্ত ভারতের মধ্যে থেকেই হিন্দু বাঙ্গালির আলাদা বাসভূমি রচনার জন্য নির্বাচনে অংশ নেওয়া। যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ভোট দিলেন, হিংস্র মানুষের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেও অনড় থাকলেন তাঁরা বীর-সাধক। যাঁরা তৈরি পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দখলদারি বজায় রাখতে নানান কৌশল অবলম্বন করলেন তারা ক্ষীর-খাদক। ক্ষীর-খাদকের সংজ্ঞা-স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য দেবার দিন হলো ২০ জুন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস।

এই পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি না হলে কী হতো? এই ভূখণ্ড পাকিস্তানে যুক্ত হতো অথবা যুক্তবঙ্গে যেত। অতি অবশ্যই পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে চলে যেত, নতুবা আলাদা একটি ইসলামিক দেশ হতো। সবাই জানেন স্বাধীন বাংলাদেশের কী পরিণতি হয়েছে। স্বাধীনতা পাবার কয়েক বছরের মধ্যে ইসলামি দেশ হয়ে গেছে। বঙ্গপ্রদেশ মুসলমান সংখ্যাধিক্যে স্বাধীন দেশ হলে জিন্না-সুরাবর্দি প্রভৃতি নেতাদের ইচ্ছেয় 'সাবসিডিয়ারি পাকিস্তান' হতো। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি একেই বলেছিলেন 'ভার্চুয়াল পাকিস্তান'। তিনি এই ভূখণ্ডটিকে কোনোমতেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে দেননি।

স্বাধীন বঙ্গের নামে 'বোরখাবৃত পাকিস্তান' হবার পথেও বাধা দিয়েছিলেন তিনি। জিন্না যখন বুঝলেন কলকাতা সমেত কিছুতেই পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, তখন বঙ্গের মুসলমান নেতাদের দিয়ে ইংরেজ গভর্নরের পরামর্শে যুক্ত ও স্বাধীন বঙ্গের নামে ভারত থেকে কেটে দিতে চাইলেন। অনেক চেষ্টা হলো, সে এক দীর্ঘ টানাপোড়েনের ইতিহাস। কুচক্রীদের মধ্যে কিছু রাজনৈতিক দল ছিল, তাদের সঙ্গে আমাদের মোলাকাতও হয়েছে, তাদের উত্তরাধিকারীদেরও আমরা চিনি। কিছু সুযোগসন্ধানী হিন্দু নেতাও ছিলেন। ভালোভাবে এদের চিনে নেবার দিনটি হলো ২০ জুন পালনের তাৎপর্য।

পশ্চিমবঙ্গ পাকিস্তানে গেলে বা স্বাধীন বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হলে অত্যাচারিত বাঙ্গালি হিন্দুর কোথাও স্থান হতো না। হয়তো প্রত্ন-ইতিহাসে হিন্দু বাঙ্গালির স্থান হতো। এখনও কলকাতায় বসে, রাজ্যের সুরক্ষিত শহরে বসে যে হিন্দু বাবু-সম্প্রদায় তোষণের চাদর গায়ে দিয়ে শ্যামাপ্রসাদের অহরহ মুণ্ডপাত করেন, তা তাঁরই করে দেওয়া ভূমির উপর। এদের সামনে সত্যের সত্তা লজ্জিত হয়। এদের মনগড়া ইতিহাস পড়তে হয়। এই ইতিহাস এতদিন বাঙ্গালি মানতে বাধ্য হয়েছে, মনে হচ্ছে আগামীদিনে আর মানবে না। বাংলায় প্রবাদ আছে, 'যে পাতে খায়, সে পাতেই থুতকায়'। ভাবুন কতখানি অকৃতজ্ঞ হলে মানুষ এটা করতে পারে! বাঙ্গালি হিন্দুর নির্যাতনের ধারাবাহিক ইতিহাস যারা ভুলিয়ে দিয়েছে তারা কী ধাতুতে গড়া!

এককথায় বলা যায়—'খায় দায় পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি।' এদের সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ নিজেই মন্তব্য করেছিলেন—'নিজেদের একটু ভারতীয় বলে ভাবুন, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' এ রাজ্যের কয়েকটি রাজনৈতিক দল স্লোগান দেয়—'বাঙ্গলা ভাগ করল কে? শ্যামাপ্রসাদ আবার কে?' কিন্তু ওদের দ্বারাই তো 'নেপোয় মারে দই' হয়েছে! ওদের বড়োবড়ো নেতাই তো পূর্ব পাকিস্তানে থাকা নিরাপদ মনে করেননি। কোটি কোটি অসহায় হিন্দুকে ওদেশে ফেলে চলে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে, বর্তমান ভূখণ্ডে। সেই বাঙ্গালি হিন্দু সামনা করলো রক্তলোলুপ নেকড়ে দের। অত্যাচারে, অগ্নিসংযোগে, ধর্ষণে, প্রিয়জনের মৃত্যুতে দলে দলে হিন্দু পালিয়ে আসতে বাধ্য হলো এপার বাঙ্গলায়। ২২ শতাংশ থেকে হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে দাঁড়ালো ৮.৫ শতাংশ। নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গের ওই নেতারা ওত পেতে বসে রইলেন সীমান্ত ডিঙোনো ভিটেমাটি হারানো উদ্বাস্তুদের একে একে ধরার জন্য। তাদের কাঁধে ভর দিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং দখল হলো। কয়েক দশক ধরে বাঙ্গলার সংস্কৃতিকে একেবারে পালটে দিল তাদের কনসার্ট। শ্যামাপ্রসাদকে ভুলিয়ে দিলেন; তাঁকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিলেন। আপনাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কবি নজরুল ইসলামকে চিকিৎসার যাবতীয় সহায়তা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। নজরুল কিন্তু তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে মনে করেননি, তাই তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। চিকিৎসায় খরচ জুগিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য নিজের প্রবাসগৃহে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে। বাঙ্গলায় যে সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, সেই ফজলুল হকও তাঁকে সাম্প্রদায়িক মনে করতেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন তিনি ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির উচ্চতর পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন। মুসলমান ছাত্রদের নানাভাবে সহায়তা করতেন যিনি, তাঁকেই ওরা সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিলেন। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, 'পাপ করেছো রাশিরাশি। ভুগবে কী তোমার মাসিপিসি?' মানুষ যত সত্য ইতিহাস জানছে, মানুষের থেকে ওরা ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এখন আন্দোলনকে অশুভ পথে নিয়ে যাচ্ছে।

দেশ ভাগ হলো। দেশভাগের সমর্থক ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। 'Jinnah got Pakistan, but it was one he called 'moth-eaten' because he lost East Punjab and West Bengal.' পোকাকাটা পাকিস্তান জিন্নাকে উপহার দেবার কৃতিত্ব শ্যামাপ্রসাদের। বলা হয়, 'He was sucessful in mobilizing the Hindu community for division; Sarat Bose and his allies could not resist.' নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা শরৎচন্দ্র বসু, কংগ্রেসের কিরণ শঙ্কর রায়, মুসলিম লিগের শহিদ সুরাবর্দি প্রমুখের সঙ্গে বাঙ্গলার গর্ভনর বরোজের ইচ্ছাও জলে গেল। ভাইসরয়

মাউন্টব্যাটেনের ইচ্ছেকেও সুকৌশলে পিছনে ফেলে দিলেন শ্যামাপ্রসাদ। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভূখণ্ডটিকে ভারতে ধরে রাখার রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও জনসমক্ষের আন্দোলনে শ্যামপ্রসাদ জিতলেন। তাই সংসদে তিনি নেহরুর মুখের উপর শুনিয়ে দিতে পেরেছিলেন, 'You divided India, I divided Pakistan.'

'শ্যামাজননীর মহাপ্রসাদ শ্যামাপ্রসাদ'। কবিশেখর কালিদাস রায় কবিতাতে এই মন্তব্য করেছিলেন। বাঙ্গলায় শ্যামাপ্রসাদের আবির্ভাব মহাকালীর প্রলয় নৃত্যের মতো। হিন্দু বাঙ্গালিকে বাঁচানোর জন্য; সারাদেশে 'এক বিধান, এক নিশান, এক প্রধান' করবার নেতৃত্ব দিয়ে খেসারত দিলেন তিনি। আত্মবলিদান দিলেন। মনে পড়বে স্বামী বিবেকনন্দের 'Kali the Mother' কবিতাটি :

'যে দেয় দুঃখে প্রেম
মৃত্যুকে ধরে বক্ষে
প্রলয় নৃত্যে মত্ত
মা-যে আসে তারই চিত্তে।'

২০ জুন বঙ্গবসীকে একথা বারবার মনে করানোর জন্য আসে।
শরৎ-কিরণ-সুরাবর্দির 'ভার্চুয়াল পাকিস্তান'
ভোকাট্টা করে আনলো ছিনে মুখার্জির ওই গান।
যুক্ত-স্বাধীন বাঙ্গলার নামে যাবতীয় শয়তানি
বিশে জুন তার সামূহিক বিষ ভাঙিয়া দিল আনি।

পশ্চিমবঙ্গ একটি আশার নাম, পশ্চিমবঙ্গ একটি আশ্রয়ের নাম। এই বাঙ্গলার রূপেই আছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। এটাই বিশুদ্ধ বাঙ্গলা।

আসুন, এক ঝলক দেখে নিই সে সময় বাঙ্গলার পরিস্থিতি কেমন ছিল? কেন ভাগ করতেই হলো? ৬০০ বছরের বাঙ্গলায় ইসলামি শাসনের ইতিহাস বাঙ্গালি ভোলেনি। সেই ৬০০ বছরে ধ্বংস হয়েছে বাঙ্গলার হিন্দু, বৌদ্ধ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দির ও প্রতিষ্ঠান। মাঝে ইংরেজ রাজত্বের ২০০ বছরে অনেকটা শান্তির পর ১৯৩৭ সাল থেকে মুসলিম লিগের শাসন, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট শুরু হওয়া কলকাতার বীভৎস নরসংহার, তারপর নোয়াখালিতে হিন্দু গণহত্যার পর অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা শ্যামাপ্রসাদ বলতে বাধ্য হলেন, ভারত ভাগ হোক বা না হোক, বাঙ্গলাকে খণ্ডিত করতেই হবে, তা না হলে বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে অমৃতবাজার পত্রিকা গ্যালপ পোলের রেজাল্ট প্রকাশ করেছিল, সেখানে দেখা গেল ৯৮.৩ শতাংশ বাঙ্গালি-হিন্দু সেই সময় বঙ্গবিভাজন সমর্থন করছেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে জানানো হয়, প্রদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে ১০৬টি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে তার মাত্র ৬টিতে বাঙ্গলা ভাগের বিরোধিতা করা হয়েছে। এই ভাবনায় সঙ্গী হয়েছিলেন বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। ১৯৪৭ সালের ২২ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জনসভায় শ্যামাপ্রসাদকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখলেন ঐতিহাসিক ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন। সেই বছর ৭ মে একটি তারবার্তা সরকারের কাছে পাঠালেন শিক্ষাবিদদের একটি দল, তাতে সামিল হলেন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, ড. শিশির মিত্র, ভাষাচার্য ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। তারা লিখলেন, বাংলাদেশে একটানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে এবং শিক্ষা, ব্যবসা ও শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। নানান সভার ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার,

রাজনৈতিক নেতা বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ বঙ্গবিভাজনের সমর্থনে কথা বললেন।

শ্যামাপ্রসাদের যুক্তি ছিল মুসলমানগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি যদি হিন্দুপ্রধান ভারতে না থাকতে পারে তবে হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিই বা ইসলামি পাকিস্তানে যাবে কেন? যে নীতিতে ভারত ভাগ হচ্ছে সেই একই নীতি মেনে পাকিস্তানকেও ভাগ করতে হবে। ভারতের সংলগ্ন হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

হালে পানি না পেয়ে যুক্ত বঙ্গের সমর্থকরা স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গদেশ গঠনের ডাক দিলেন। যৌথডাক এলো মুসলিম লিগ নেতা সুরাবর্দি এবং নেতাজীর দাদা শরৎচন্দ্র বসুর কাছ থেকে। কিন্তু এই ফাঁদে বাঙ্গালি হিন্দু পা দেয়নি। কারণ সুরাবর্দির জিঘাংসক ব্যক্তিত্ব তখনও হিন্দুদের কাছে তরতাজা, অমলিন। শরৎ বসু একলা ডাক দিলে কী হতো, বলা যায় না, বাঙ্গালি হিন্দু ভুল করলেও করতে পারতো।

পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার চক্রান্ত ইদানীং কালেও চলেছে। ২০১৬ সালের ২৯ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার এক বিশেষ অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়কদের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের নতুন নাম হবে 'বাংলা'। হিন্দিতে 'বঙ্গাল'। ইংরেজিতে 'বেঙ্গল'। সিপিএমের এই পরিবর্তনে আপত্তি ছিল না, কারণ এর আগে জ্যোতি বসুর আমলে তারাই ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার এই প্রস্তাব এনেছিল।

২০১৮ সালের ১৫ জুলাই সব ভাষাতেই 'বাংলা' নাম হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত হয়। যুক্তি ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল নাম থাকলে কেন্দ্রীয় আলোচনায় ইংরেজি বর্ণানুক্রমিকের শেষে সুযোগ পায় পশ্চিমবঙ্গ। অসুবিধা কাটাতে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' নামটি বাদ যাক, 'বাংলা' করা হলে 'বি'-এর কারণে দৌড়ে এগিয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ আবেদন করতেই পারতো, কেন্দ্রীয় আলোচনায় একবার শুরু হবে 'এ' থেকে, পরের বার 'জেড' থেকে। তাহলে তো ইংরেজি বর্ণানুক্রমে কোনো বৈষম্য থাকে না!

আসলে তাদের উদ্দেশ্যে সৎ ছিল না, ইতিহাস ভোলানোই ছিল তাদের কাজ। আলোচনা তো এমন ভাবেও হতে পরতো, রাজ্যের নামগুলি কম্পিউটারে র‍্যানডম পদ্ধতিতে ঠিক হবে। নাম পালটিয়ে 'Paschimbanga' করা যেতে পারতো, তা কিন্তু হলো না, অন্য মোটিভ কাজ করছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের আপত্তিতে এ দুরভিসন্ধি বাস্তবায়ন হয়নি। কিন্তু এটার মধ্যে সততা ছিল না, মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পেরে গেছিল।

এ প্রসঙ্গে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০০০ সালের জুলাই মাসে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বাঙ্গালি অধ্যাপক, যিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সাংসদ হয়ে দিল্লি গিয়েছিলেন, বললেন, 'বঙ্গভঙ্গের প্রবক্তাকে যদি আমরা বাঙ্গালির নায়ক বা পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা হিসেবে মানতে চাই, তাহলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নয়, লাটসাহেব কার্জনকেই আমাদের পুজোর বেদিতে বসিয়ে আরাধনা করা উচিত।' শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে একজন ইতিহাসের অধ্যাপকের এহেন মন্তব্য খুবই কুরুচিপূর্ণ! স্বদেশী জাগরণ তথা স্বাবলম্বী ভারত গঠনের বর্তমান কালপর্বে দাঁড়িয়ে বাঙ্গালিদের নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিতে হবে না, ১৯০৫ এবং ১৯৪৭ সালের প্রেক্ষাপট কী ছিল! বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল ব্রিটিশদের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান বিভেদ সৃষ্টির জন্য। আর স্বাধীনতার বছরে বঙ্গবিভাগ হয়েছিল মুসলমান আগ্রাসকদের দ্বারা হিন্দুর মান-ইজ্জত ও সম্পত্তি রক্ষার গুরুতর অভিযোগের চিরস্থায়ী সুরাহা করতে। যে ব্যক্তি বাঁদর আর শিবের প্রভেদ বোঝেন না, তাকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই মানায় না; অথচ বিনা প্রশ্নে তিনি সংসদে চলে গেলেন। তাঁরই পূর্বজ শরৎচন্দ্র বসুর অপ্রাপ্তি কী তাকে এই মন্তব্য করতে প্ররোচিত করেছে; নাকি আরও গভীরতম অস্পষ্টতা আছে?

শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন অখণ্ড ভারতের সাধক। তাই অখণ্ড বঙ্গেরও বীজমন্ত্র তিনি জপ করতেন। বঙ্গবিভাগ নিয়ে তখন আলোচনা আন্দোলন চলছে। হিন্দু মহাসভার কয়েকজন যুবকর্মী শ্যামাপ্রসাদের কাছে এলেন। বললেন, দেশ তো বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার আন্দোলনের মাধ্যমে উদ্দীপিত হয়েছে আজ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করলে সেটা কী স্ববিরোধী হবে না? শ্যামাপ্রসাদ উত্তর দিলেন, 'এই সেন্টিমেন্ট আমার ছিল। কিন্তু সেন্টিমেন্ট যেন বাস্তববোধকে আচ্ছন্ন না করে। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে হিন্দু ভোটদাতারা আমাদের কোমর ভেঙে দিয়েছে। দেশবিভাগে বাধা দেওয়ার শক্তি আমাদের নেই। লক্ষ লক্ষ বিহারি, ওড়িশি বাঙ্গলায় করে খাচ্ছে। তাই সেখানে বাঙ্গালিরা আছে। গোটা বাঙ্গলা পাকিস্তানে পড়লে তাদের ফিরে যেতে হবে। সেখানে তখন বাঙ্গালিরা থাকতে পারবে? কোটি কোটি বাঙ্গালি কোথায় যাবে? কে ঠাঁই দেবে? তাদের সবাইকে ধর্মত্যাগ করতে হবে নিজেদের বাঁচাতে। তাই বাঙ্গলার যতখানি সম্ভব রক্ষা করতে চেষ্টা করছি।' তিনি একটি সভায় দাবি করেছিলেন, 'If this succeeds, the East Pakistan will virtually perish.' পরবর্তীকালে তাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান আলাদা দেশে ভেঙে গেল। □

## শোকসংবাদ

মালদা নগরের উত্তরায়ণ শাখার স্বয়ংসেবক অনুপ কুমার মণ্ডল গত ১০ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি ১পুত্র ১ কন্যা রেখে গেছেন। তাঁর পুত্রও স্বয়ংসেবক।

* * *

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজের আলমনগর শাখার খণ্ড প্রমুখ দীনেশ বাগের মাতৃদেবী প্রমীলা বাগ গত ১৫ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

# অগ্নিপথ প্রকল্পে নিয়োগের নোটিফিকেশন জারি

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** ভারত সরকারের নতুন প্রকল্প অগ্নিপথে নিয়োগের নোটিফিকেশন জারি করল ভারতীয় সেনা। এই নোটিফিকেশনে বলা হয়েছে, যেসব প্রার্থী অগ্নিপথ প্রকল্পে যুক্ত হতে চান তাদের অবশ্যই অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অগ্নিপত প্রকল্প ভারতীয় সেনায় নিয়োগের নতুন পদ্ধতি। এই প্রকল্পে যারা যোগ দেবেন তাদের অগ্নিবীর খেতাব দেওয়া হবে। সেনার তরফ থেকে জানানো হয়েছে ভারতীয় সেনায় অগ্নিবীরদের স্থান হবে সব থেকে মর্যাদাব্যঞ্জক। চার বছর হবে অগ্নিবীরদের কার্যকাল। এই চার বছরে অগ্নিবীরেরা যা শিখবেন বা সেসব গোপন তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত হবেন, তারা তা গোপনীয়তা আইন, ১৯২৩ অনুসারে ভারতীয় সেনার সঙ্গে যুক্ত নন, এমন কাউকে বলতে পারবেন না। অগ্নিপথ প্রকল্পে নিয়োগ শুরু হয়ে যাবার পর এই প্রকল্পের যোগ্যতামান পেরনো প্রার্থীরাই সেনার রেগুলার ক্যাডার হিসেবে যোগ দিতে পরবেন। নিয়োগের পর কার্যকাল (চার বছর) শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ অবসর নিতে পারবেন না।

কিছুদিন আগেই অগ্নিপথ প্রকল্প ঘোষণা করেছে কেন্দ্র সরকার। প্রথমে বলা হয়েছিল সাড়ে সতেরো থেকে একুশ বছরের মধ্যে যাদের বয়েস তারাই এই প্রকল্পে যোগ দিতে পারবেন। পরে বয়েসের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে তেইশ বছর করা হয়। সেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সেনা আইন ১৯৫০ অনুসারে এই নিয়োগ হবে। এই প্রকল্পে নিযুক্ত প্রত্যেক সেনাকে স্থলবাহিনী, নৌসেনা বা বায়ুসেনা— যেখানে বলা হবে সেখানে গিয়ে কাজে যোগ দিতে হবে। চার বছরের কার্যকাল শেষ হবার পর অগ্নিবীরদের প্রতিটি ব্যাচকে সেনার রেগুলার ক্যাডার হিসেবে যোগ দেবার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে এই সুযোগ প্রতিটি ব্যাচের ২৫ শতাংশ প্রার্থীর ক্ষেত্রেই মিলবে। যাদের বয়েস আঠারো বছরের কম ভর্তির ফর্মে, তাদের অভিভাবকদের সাক্ষর করতে হবে। অগ্নিবীরেরা বছরে তিরিশদিন ছুটি পাবেন। সেনা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধিতায় সাম্প্রতিক আন্দোলনে যারা যুক্ত ছিলেন তারা সেনার কোনও বিভাগেই যোগ দিতে পারবেন না। পুলিশি ছাড়পত্র মেলার পরেই অগ্নিপথ প্রকল্পে নিয়োগের জন্য আবেদন করা যাবে।


## যোগ চিকিৎসা ডিপ্লোমা কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এন্ড রাজযোগ
(D.A.T.H.R.Y.)

**পাঠ্যসূচী ঃ** ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ, অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এন্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস, ইন্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজ (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারোপ্যাথি, রাজযোগ, ও কুন্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাকটিস, স্ট্রেস (Stress) ম্যানেজমেন্ট, যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন - প্রাণায়াম - মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক - চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বছর। ২৬শে জুন থেকে আরম্ভ।
যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ।
ক্লাস ঃ প্রতি রবিবার ১টা থেকে ৪টা।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট
1977
অব কালচার, যৌগিক কলেজ
Regd. NGO, NITI AAYOG, New Delhi, Govt. of India

কোর্স ফি ঃ ১০,০০০ টাকা। এককালীন ৮০০০ টাকা। ইনস্টলমেন্টে প্রথমে ৫০০০ টাকা, পরের মাসে ২৫০০ টাকা করে।

ফর্ম ও প্রসপেক্টাস ঃ ১০০ টাকা
১০১, সার্দান অ্যাভিনিউ, কল-২৯
9051721420 / 9830597884

# কুয়োর্তেন গেমসে সোনা জিতলেন নীরজ

**বিশেষ প্রতিনিধি।।** অলিম্পিকে সোনা জয়ের পর ফিনল্যান্ডের কুয়োর্তেন গেমসে প্রথম প্রয়াসেই জ্যাভেলিন ছুড়ে সোনা নিশ্চিত করলেন নীরজ চোপড়া। গত ১৮ জুন ফিনল্যান্ডের আন্তর্জাতিক গেমসে ৮৬.৬৯ মিটার দূরত্ব স্পর্শ করে নীরজের জ্যাভেলিন।

তারপরের দুটি থ্রো অবশ্য ফাউল করেন নীরজ। তৃতীয়বার ট্র্যাকে দৌড়তে গিয়ে বিপজ্জনকভাবে পিছলে পড়েন তিনি। তাঁকে রীতিমতো আছাড় খেতে দেখে আৎকে উঠেছিলেন দর্শকরা। তবে সবাইকে আশ্বস্ত করে ২৪ বছর বয়সি নীরজ বলেন, ''আমি ভালো আছি। চোটজনিত আশঙ্কার কারণ নেই। আবহাওয়া খুবই খারাপ ছিল। টোকিয়ো অলিম্পিকের পর এখানে দ্বিতীয় সোনা জিতে ভালো লাগছে। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাই।''

ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীরা অবশ্য আশা করেছিলেন কুয়োর্তেন গেমসের ইভেন্টেই

৯০ মিটারের ম্যাজিক ফিগারে জ্যাভেলিন ছুড়বেন নীরজ। কিন্তু সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এদিন পাভো নুরমি গেমসের থেকে (৮৯.৩০) কম দূরত্বে জ্যাভেলিন নিক্ষেপ করে কুয়োর্তেনে সোনা জেতেন নীরজ। পাভো নুরমি গেমসে নিজের জাতীয় রেকর্ডও (৮৮.০৭ মিটার) ভেঙেছিলেন তিনি। কুয়োর্তেনে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন ২০১২ অলিম্পিক সেরা ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর কেসহর্ন ওয়ালকট (৮৬.৬৪ মিটার)। তৃতীয় হন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স (৮৪.৭৫ মিটার)। এই থ্রোয়ারই এখন নীরজ চোপড়ার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। গতমাসে দোহা ডায়মন্ড লিগে ৯৩.০৭ মিটার বর্শা ছুড়ে সোনা জিতেছিলেন পিটার্স। যাকে বিশ্ব সার্কিটে বলা হচ্ছে 'মনস্টার থ্রো'। এ প্রসঙ্গে নীরজ বলেছেন, ''৯০ মিটার থ্রো করা কঠিন নয়। আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার লক্ষ্য ডায়মন্ড লিগে একটা দারুণ সূচনা করা।'' জুনের ৩০ তারিখ থেকেই স্টকহোমে শুরু হচ্ছে জ্যাভেলিনের ডায়মন্ড লিগ।

## বিশেষ ঘোষণা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাজ বাঙ্গলায় গত ১৯৩৯ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। সেই কাজে বাঙ্গলা তথা ভারতের বহু কার্যকর্তা ও প্রচারকের পরিশ্রম নিহিত আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রয়াত, অনেকে খুবই বৃদ্ধ। তাই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বাঙ্গলার সঙ্ঘকাজের প্রারম্ভিক ইতিহাস তুলে ধরা প্রয়োজন। এই কাজ স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট হাতে নিয়েছে। আগামী শুভ জন্মাষ্টমী, ২০২২ তিথিতে **'বাঙ্গলায় সঙ্ঘের কাজের ইতিহাস'** নামক এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে চলেছে। সহযোগ রাশি ২৫০/ টাকা। প্রকাশপূর্ব রাশি ১৫০/ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব রাশি দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২২। জেলা অনুসারে অথবা ব্যক্তিগত ভাবে টাকা পাঠাতে পারেন। সরাসরি টাকা ব্যাংকে পাঠানোর জন্য নীচে ব্যাংকের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো। টাকা ব্যাংকে পাঠানোর পর তপন সাহা (মো: ৯৯০৩০০২৯০১) অথবা মহেন্দ্র নারায়ণ দাস (মো : ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭)— এই দু'জনের কাউকে অবশ্যই জানাবেন।

বইটি কীভাবে সংগ্রহ করবেন তা লিখে জানাবেন। ডাকযোগে নিতে হলে ডাকমাশুল আলাদা ভাবে পাঠাবেন।

Account Name : **SWASTIK PRAKASHAN TRUST**
A/C. No. : **0954000100121397**
IFS Code : **PUNB0095400**
Bank Name : **PUNJAB NATIONAL BANK**
**VIVEKANAND ROAD**
**Kolkata - 700 006**

# সংসদের শীতকালীন অধিবেশন হবে সেন্ট্রাল ভিস্টায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** এবছর সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মাধ্যমেই ভারতের নবনির্মিত সংসদ ভবন 'সেন্ট্রাল ভিস্টা'র পথ চলা শুরু হবে। একথা জানালেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। অক্টোবরের মধ্যেই নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা।

সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রকল্পের নির্মাণের শুরু থেকেই বিরোধীরা বাধা দিয়ে এসেছে। নানা কারণ দেখিয়ে এই প্রকল্প বন্ধের জন্য মামলা পর্যন্ত হয়েছে। সমস্ত জট কাটিয়ে পরিশেষে সুপ্রিম কোর্ট সেন্ট্রাল ভিস্টাকে ছাড়পত্র দেয়। গত মে মাসে কংগ্রেসের তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়, সংসদের নতুন ভবনের নাম রাখা হোক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের নামে। এই আরজি জানান দিল্লির প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রধান অনিল কুমার।

# বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পর্যাপ্ত কয়লা মজুত, জানালো কেন্দ্র

**নিজস্ব সংবাদদাতা।।** ভারতের বিভিন্ন কয়লাখনিতে সবমিলিয়ে ৫২ মিলিয়ন টনের বেশি কয়লা মজুত রয়েছে, যা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির ২৪ দিনের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট। গত ১৯ জুন একথা জানিয়েছে কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রক। এক বিবৃতি জারি করে মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, '১৬ জুন তারিখে ভারতের বিভিন্ন কয়লাখনিতে কয়লার জোগান ছিল ৫২ মিলিয়ন টনের বেশি। এছাড়াও বিভিন্ন গুড শেড সাইডিং, বেসরকারি ওয়াশারি ও বন্দরগুলিতে আরও ৪.৫ মিলিয়ন টন কয়লা রয়েছে। যা প্রয়োজনে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিকে সরবরাহ করা হবে। প্রসঙ্গত, কয়েক সপ্তাহ আগে কয়েকটি রাজ্যে হঠাৎ বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় বিরোধীরা কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সেই প্রসঙ্গেই কয়লা মন্ত্রক জানায়, 'অহেতুক আশঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। আগের তুলনায় এখন ভারতের কয়লা উৎপাদনের হার অনেক বেশি।

শিল্পক্ষেত্রের জোগান অব্যাহত রাখতে কয়লা আমদানিও করা হচ্ছে।'

উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে বিদ্যুৎক্ষেত্রে কোল ইন্ডিয়ার তরফে রেক সরবরাহ সর্বকালীন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ২০২০-২১ সালে যেখানে প্রতিদিন গড়ে ২১৫.৮টি রেক লোড করা হত, সেখানে চলতি অর্থবর্ষে তা ২৬ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২৭১.৯টি রেক। বিবৃতিতে বলা হয়েছে ঘরোয়া কয়লার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে গত ১৬ জুন কয়লার মজুত বেড়ে হয়েছে ২২.৬৪ মিলিয়ন টন। যেখানে গত ১ জুন মজুত ছিল ২১.৮৫ মিলিয়ন টন। মন্ত্রকের তরফে দাবি করা হয়, 'এতেই স্পষ্ট যে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কয়লার উৎপাদন ও সরবরাহ দুটোই উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।'

তাছাড়াও বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে কয়লার পর্যাপ্ত সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে তিন মাসের মধ্যে ২.৪ মিলিয়ন টন কয়লা আমদানি করার জন্য টেন্ডার দিয়েছে কোল ইন্ডিয়া। তিন দফায় মোট ১৫.৪ মিলিয়ন আমদানি করা কয়লা পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমকে সরবরাহ করবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। পাশাপাশি কয়লা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কয়লাখনি অঞ্চলের কাছে থাকা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতেও কয়লার জোগান এখন দূরের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির থেকে অনেক বেশি।

# আদর্শ প্রচারক বাবা যোগেন্দ্র : মোহন ভাগবত

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** সংস্কার ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদ্যপ্রয়াত প্রবীণ প্রচারক বাবা যোগেন্দ্রকে 'সঙ্ঘের প্রচারকদের আদর্শ' বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবত। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, 'এমন একজন আদর্শ প্রচারক আমরা আর পাব না।'

সম্প্রতি বাবা যোগেন্দ্র লক্ষ্ণৌতে ৯৮ বছর বয়েসে পরলোকগমন করেছেন, তাঁরই স্মরণে সত্য সাঁই ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে আয়োজিত এক ভাবগম্ভীর সভায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একথা বলেন মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, 'বাবা যোগেন্দ্রের জীবন ছিল খোলা বইয়ের

মতো। সেই বইয়ে লিপিবদ্ধ অনুশাসন আমরা যদি মেনে চলতে পারি তাহলেই তাঁর আদর্শ বেঁচে থাকবে। শিল্প-সংস্কৃতির জগতে সত্যম শিবম সুন্দরমের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর লিখিত বার্তায় জানান, বাবা যোগেন্দ্রের মৃত্যুতে শুধু সংস্কার ভারতীর ক্ষতি হলো না, সারা পৃথিবীর শিল্প-সংস্কৃতি জগতে এক নিদারুণ শূন্যতা নেমে এল। স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এবং বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও সাংসদ সোনাল মান সিংহ। সোনাল মান সিংহ বলেন, 'বাবা যোগেন্দ্র একজন অসাধারণ শিল্পী ও নির্দেশক। তিনি শিল্পীদের প্রকৃত অভিভাবক হয়ে উঠে তাদের পথ দেখাতে পারতেন। বাবা যোগেন্দ্রের পথ অনুসরণ করে সংস্কার ভারতী সারা দেশে বিশিষ্ট স্থান লাভ করবে।'

# ।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৫।।

*বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টুমিও বাড়ছিল। এরই মধ্যে একদিন স্নানের ঘাটে ডুবে যাচ্ছিলেন বঙ্কিম। তখন তার বয়স মাত্র তিন বছর। আমজাদ তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করেন।*

*চার বছর বয়স হলো। পাঁচ বছর বয়সি কয়েকটি ছেলের হাতেখড়ি হবে। বঙ্কিম জেদ ধরলেন তাঁরও হাতেখড়ি দিতে হবে। অবশেষে তাই হলো।*

*(ক্রমশ)*